মার্গত্রয়

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গ।



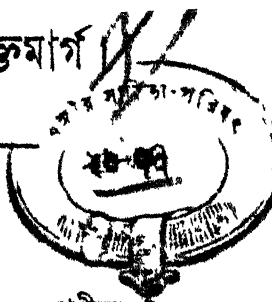
[illegible]

শ্বেত-সরোজ-গ্রন্থাবলী—২

মার্গত্রয়

বা

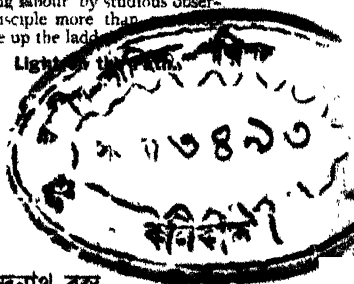
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ



শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী বি-এ-প্রণীত।

"Seek out the way. Seek it not by any one road. To each temperament there is one road which seems the most desirable. But the way is not found by devotion alone, by religious contemplation alone, by ardent progress, by self sacrificing labour, by studious observation of life. None alone can take the disciple more than one step onwards. All steps are necessary to make up the ladder."

Light on the Path.



প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু,

হোয়াইট্ লোটাস্ পাব্লিসিং কোম্পানী,

২ নং কৈলাস দাসের লেন।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

কলিকাতা, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট হইতে,
শ্রীসত্যচরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৯।

উৎসর্গ পত্র।

পিতৃদেব! আজ প্রায় আঠার বৎসর আপনি এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনার স্মৃতি আমার অন্তর হ'তে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী হইতে নর-নারী প্রভৃতি যাবতীয় জীবে দয়া আমি আপনাতে মূর্ত্তিমতী দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, কুকুর, বিড়াল বা পক্ষীর আর্ত্তস্বর শত গোলমাল ভেদ করিয়াও আপনার কর্ণে প্রবেশ ও মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। দেখিয়াছি, যখন আমাদের দারুণ অর্থক্লেশ, সংসার চলা ভার, তখনও আপনি এক টাকা হইতে অন্ততঃ চারি আনা কোনও দরিদ্র ভিক্ষুককে গোপনে দান করিয়াছেন। আরও দেখিয়াছি, যে দিন আমি (৮।১০ বৎসরের বালক), মানুষ মাত্রই একদিন মরিবে, ইহা শুনিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁদিতেছিলাম, সেইদিন আপনি কোমল হস্ত আমার গাত্রে বুলাইয়া বলিয়াছিলেন, "ছি! বাবা! ভগবান্ যা করেন সবই ভাল, ইহাতে দুঃখ করিতে নাই।" পিতঃ! আপনার অপার্থিব করুণা ও অসামান্য ভগবদ্ভক্তি আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আপনার অযোগ্য সন্তান, আপনার উপযুক্ত কিছুই করিতে পারিলাম না। তাই, যে ভগবান্ আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ছিলেন, তাঁহাকে লাভ করিবার "মার্গত্রয়" আজ আপনারই পবিত্র চরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ইহার উদ্দেশ্য সফল হয়। ইতি—

দাসানুদাসস্য—শ্রীমাখনলাল।

মুখবন্ধ।

“মার্গত্রয়”-নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচারিত হইল। ইহাতে সাধারণে সহজে বুঝিতে পারেন, এইরূপ সরলভাবে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সাধন-মার্গের কথা ভাগবত প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে থাকিলেও, পৃথক করিয়া আবার এই পুস্তক প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন কি? এরূপ প্রশ্নের এইমাত্র উত্তর দিতেছি;—রত্নাকর-গর্ভে অপরিমিত রত্নরাজি নিহিত আছে—আকরে মণি-স্তূপ লুক্কায়িত আছে—তাহাতে সাধারণের উপকার কি? যাহার সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে, সুযোগ আছে, সেই নানা বাধা অতিক্রম করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে মণি আহরণ করিতে সমর্থ হয়। সাধারণ মানব কিন্তু, তাদৃশ কর্ম্মঠ লোকের দ্বারা আহৃত মণিরত্নে আপনা-দিগের রত্নোপভোগলালসা মিটায়।

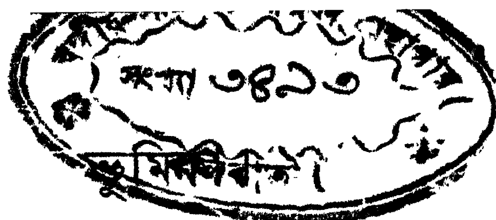
আমাদিগের এই পুস্তক-প্রচারের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু পাছে, কেহ মনে করেন যে, আমরা স্ব স্ব বা পর-কপোল-কল্পিত কোন একটা অশাস্ত্রীয় নব্য মত প্রচার করিতেছি, এই আশঙ্কায়, আমরা প্রত্যেক মার্গের শেষে নানা শাস্ত্র হইতে বিবিধ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমরা এই বিভাগকে “সাধক-শাস্ত্র-বচন,” এই নামে অভিহিত করিয়াছি। শাস্ত্রের যে সমস্ত উক্তি আমাদিগের আলোচিত মতগুলির

সমর্থন করিতেছে, তাহাই "সাধক শাস্ত্র-বচন"। প্রাচীন আর্য্য দর্শনে "সাধক"-শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইখানি 'শ্বেত-সরোজ-পুস্তকাবলী'র দ্বিতীয় পুস্তক। সাধারণের সাধন-পথের সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বিবিধ পুস্তক প্রচার করিয়া আমরা এই মালা রচনা করিব। যে উদ্দেশ্যে এই শতদলটি অবচিত হইয়াছে, ইহা যদি তৎ সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমাদিগের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

১০ই আশ্বিন, ১৩১৯।
২নং কৈলাসদাসের লেন,
কলিকাতা।

নিবেদক,
শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক।



কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয়া শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট "Three Paths" নাম দিয়া মার্গত্রয় সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। আমার বন্ধু, শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই "মার্গত্রয়" রচনা করিয়াছেন। ইহা "Three Paths" গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র নহে, মাখনবাবু নিজের কথা অনেক স্থলে সংযোজিত করিয়াছেন। ফলে, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার "মার্গত্রয়" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগের যুক্তবেণীতে সম্মিলিত হইয়া মহাতীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিধারা এইরূপে যদি ভগবানের চরণে গিয়া মিলিত হইতে পারে, তবে জীব ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়।

এই ভারতবর্ষে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে "গন্তব্য-স্থান সুখধাম, বৈকুণ্ঠ যাহার নাম"—সেইস্থানে পৌঁছিবার জন্য তিনটী মার্গ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ। জীবগণ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে কেহ কর্ম্মমার্গে, কেহ জ্ঞানমার্গে, কেহ ভক্তিমার্গে সেই বৈকুণ্ঠের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। পথ সুদীর্ঘ, পথে নানা বাধা-বিঘ্ন। এই দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া পান্থ শ্রান্ত হইতেছে। কিন্তু তাহার

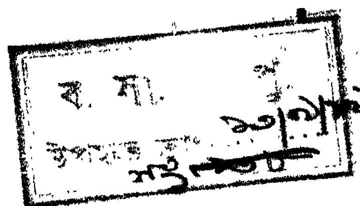
দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে বৈকুণ্ঠের শুভ্র জ্যোতির প্রতি। তাই সে জ্যোতির জ্যোতির অন্বেষণে অগ্রসর হইতে পারিতেছে।

কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ যখন একই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকা উচিত নহে। ফলে কিন্তু দেখা যায় যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত—যিনি যে পথে চলিতেন, তিনি ভাবিতেন যে সিদ্ধির সেই একমাত্র পথ—আর দ্বিতীয় পথ নাই। যিনি কর্ম্মবাদী, তিনি ভাবিতেন, বেদের কর্ম্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। সেইজন্য কর্ম্মমার্গের পথিক কর্ম্মকেই সংসার-তরণের একমাত্র উপায় মনে করিতেন। অন্য পক্ষে জ্ঞানবাদী বলিতেন, যে কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হয় না। কর্ম্ম ভঙ্গুর। কর্ম্মের ফল অস্থায়ী। কর্ম্ম বন্ধের কারণ। অতএব জ্ঞানবাদীর মতে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। পক্ষান্তরে যিনি ভক্তিমার্গী, তিনি জ্ঞান কর্ম্ম উভয়কেই ভক্তির অন্তরায় বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন, জ্ঞানকর্ম্মদ্বারা অসংবৃত যে ভক্তি তাহাই উৎকৃষ্ট সাধন। অথচ প্রকৃত সাধকদিগের পক্ষে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী নহে। তিনটীই সার্থক, যদি ভগবানের অভিমুখে সাধককে অগ্রসর করিয়া দেয়। মাখন বাবু 'মার্গত্রয়ে' যে ভাবে এই তিন মার্গের বিবরণ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, কোন মার্গই অবহেলার নহে। বস্তুতঃ জীবের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল কর্ম্ম, কেবল

জ্ঞান, কেবল ভক্তি যথেষ্ট নহে। সাধনার চরম যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহাতে সিদ্ধ হইতে হইলে এই মার্গত্রয়ের সমন্বয় করিয়া সাধককে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অংশ। সে নিজেও সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম অগ্নি—জীব স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গকে অগ্নির পূর্ণত্বে বিকশিত করিতে হইলে জীবের সদ্ভাব, চিদ্ভাব ও আনন্দভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ করা চাই। জীবের এই তিন ভাবের বিকাশোপযোগী তিনটি মার্গ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এইজন্যই মার্গত্রয়ের উপযোগিতা।

মাখনবাবুর গ্রন্থের দ্বারা যদি মোক্ষমার্গীর সাধন পথে কিছুমাত্রও সহায়তা হয়, তবে তাঁহার এই গ্রন্থ-প্রচার সার্থক হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।



মার্গত্রয়

বা

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ।

১। কর্ম্ম-মার্গ।

তিনটি নদী তিন দিক হইতে আসিয়া এক অসীম সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। প্রথমে তাহাদিগের মধ্যে খুবই অন্তর,—বিশাল ব্যবধান ছিল, কিন্তু তাহারা যতই সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, ততই এই ব্যবধান কমিয়া আসিয়াছে। শেষে, সমুদ্রের নিকটে আসিয়া তাহারা প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। যে সূক্ষ্ম ব্যবধান এখনও তাহাদের মধ্যে আছে, তাহার ভিতর দিয়া এক নদীর জল অপর নদীতে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। প্রকৃত তাহারা এখন নামে তিনটি নদী হইলেও কার্য্যতঃ একটিই হইয়াছে; প্রত্যেকটিতে অপর দুইটির জল মিলিত ও প্রবাহিত। পরিশেষে, সমুদ্রে গিয়া তাহারা একবারেই মিশিয়াছে, তখন আর তিনের নামমাত্র নাই, সবই এক। আবার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য উপনদী চারিদিক হইতে আসিয়া এই প্রধান নদী তিনটিতে মিলিত হইয়াছে। উপনদী-

গুলির কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে যায় নাই, একটি না একটি প্রধান নদীতেই মিশিয়া গিয়াছে। নদী তিনটির মধ্যে প্রথমটির নাম কর্ম্মমার্গ, দ্বিতীয়ের নাম জ্ঞানমার্গ এবং তৃতীয়ের নাম ভক্তিমার্গ। অসংখ্য জীব এই তিনের একটি না একটি অবলম্বন করিয়া মোক্ষরূপ মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রথমাবস্থায়, কর্ম্মমার্গী, জ্ঞান-মার্গী ও ভক্তিমার্গীর মধ্যে কিছু পার্থক্য ও প্রভেদ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা যতই অগ্রসর হন, ভগবানের যতই সন্নিকটে যান, ততই তাঁহাদের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়,—একের গুণ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়,—কর্ম্মীতে জ্ঞান ও ভক্তি উদিত হয়, জ্ঞানীতে কর্ম্ম ও ভক্তি বিকাশ পায় এবং ভক্তে কর্ম্ম ও জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। শেষে নাম ও রূপ হারাইয়া তাঁহারা ভগবানে মিশিয়া যান। এই তিনটি পথ ভিন্ন আর পথ নাই। আর যে সকল অসংখ্য পথ আছে, তাহারা এই তিনেরই অঙ্গ বা উপাঙ্গ, কোন না কোনটির সহিত মিলিত হইয়াছে[১]।

আমরা যদি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, যদি স্থিরচিত্তে প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে দেখিতে পাই যে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থের মধ্যে একই ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে। কি উদ্ভিদ্‌জাতি, কি পশুজাতি, কি মানবজাতি,—সকলের মধ্যে একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে, একই অখণ্ড্য, দুর্লঙ্ঘ্য বিধি অনুসারে সকলেই চলিয়াছে। সে বিধিটি কি? উন্নতির চেষ্টা, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা। একটি প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিকে ছিন্ন ভিন্ন

করিলেও, কোটি কোটি অংশে খণ্ড বিখণ্ড করিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা গুলি যেখানে ও যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাহাদের শিখা যেমন কদাপি নিম্নমুখী না হইয়া সদাই উর্দ্ধে উঠিতে চায়, সেইরূপ বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, নরনারী,—যাবতীয় জীবেরই অবিরাম চেষ্টা উন্নতি, উন্নতি, ক্রমাগত উন্নতি। যে বৃক্ষ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সামান্য ঘাস গাছ ছিল, আজ সে বাঁশ গাছে পরিণত হইয়াছে, যে জীব লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ভেক-রূপে কোটরে বাস করিত, সে হয়ত আজ পশুরাজ সিংহ-রূপে অরণ্যে বিচরণ করিতেছে, শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে মানবজাতি দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিত, আজ সে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ধনী ও বিজ্ঞান শিল্পাদিতে জ্ঞানী হইয়াছে। কিন্তু এত উন্নতিতেও সে কি পরিতৃপ্ত হইয়াছে ? না, কখনই না। সে যতই পায় ততই চায়। সে ক্রমাগতই সুখ চাহিতেছে, আনন্দ খুঁজিতেছে। আজ সে যে অবস্থায় আছে, ভাবিতেছে তদপেক্ষা উচ্চ অবস্থাটুকু পাইলেই সে সুখী হইবে ; কিন্তু যেমন সেই উচ্চ অবস্থাটি পাইল, অমনি তাহাতে আর সুখ রহিল না, অধিকতর উচ্চ অবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। কেন এরূপ হয় ? কেন জীবের তৃপ্তি নাই ? তৃপ্তি হইতে পারে না, কেন না, সে যাহা কিছু পাইতেছে, তৎসমস্তই অল্প। অল্পে সুখ নাই, কেবল ভূমাতেই সুখ। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"। অতএব যদবধি সে এই ভূমা না পায়, তদবধি তাহার

তৃপ্তি হইতে পারে না। সে "ভূমা"র জন্যই ব্যাকুল, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে সর্ব্বত্রই এই ভূমাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এই যে অবিরাম সুখান্বেষণ, উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা,—প্রাচ্যদেশে ইহার নাম আত্মসন্ধান এবং পাশ্চাত্যদেশে ইহাকেই Evolution বা ক্রমোন্নতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে[৩]।

ক্ষুদ্র জীবের এত স্পর্দ্ধা কেন? সে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চায়, পঙ্গু হইয়া গিরিলঙ্ঘন করিতে চায়, তার এতদূর দুরাকাঙ্ক্ষা? সে মৃত্তিকার কীট! সে কিনা ভূমানন্দ পাইতে চায়! ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে ও প্রেমে ঈশ্বরের তুল্য হইবার তাহার প্রয়াস! ইহা কি বাতুলতা নহে? না, ইহা বাতুলতা নহে, দুরাকাঙ্ক্ষা নহে! ইহা পুত্রের পৈত্রিক সম্পত্তি পাইবার ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা মাত্র। ভগবান্ নিজের অংশেই জীবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবমাত্রই সচ্চিদানন্দের কণা[৪]।

এই কণা ক্রমশঃ পূর্ণতা পাইবে, বীজটি ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে, ইহাই পরমপিতার ইচ্ছা। এই জন্যই জগৎ সৃষ্টি, জীবসৃষ্টি[৫]। সুতরাং জীবের এই আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব নহে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ভগবদভিপ্রেত। তবে, সে যে পদে পদে ভুল করে, ইহা স্বীকার্য্য। সে কি চায়, তাহা সে ঠিক জানে না। তাই সে কখনও মনে করে ধনই তাহার অন্বেষণের বস্তু, কখনও ভাবে প্রভুত্বই, কখন ভাবে পাণ্ডিত্যই তাহার আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু কোনটিতেই

তাহাকে পূর্ণভাবে পায় না। তাই তাহার তৃপ্তিও হয় না। কিন্তু পূর্ণভাবে না পাইলেও, আংশিক ভাবে পায়। ইহার প্রমাণ তাহার ক্ষণিক আনন্দ। অতএব জীব যে বস্তুতেই আনন্দ পায়, সে সমুদয়েই আত্মা বা ব্রহ্ম বিদ্যমান; কারণ, তিনিই আনন্দ, তাঁহা ছাড়া আনন্দ নাই।

জীব মাত্রই উল্লিখিত মার্গত্রয়ের কোন না কোনটি অবলম্বন করিয়া "ভূমানন্দ'' লাভের জন্যই ক্রমাগত ছুটিয়াছে। অবশ্য, প্রথমাবস্থায় সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান পূর্ব্বকই চলিতে থাকে, তাহার গন্তব্য স্থান কোথায়, লক্ষ্য কি, কি উপায় দ্বারা সত্বর ও সহজে অগ্রসর হইবে, এ সকল কিছুই জানে না। যেন ভূততাড়িত হইয়া কর্ম্ম করে। যাহা ভাল লাগে তাহা খায়, যাহাতে সুখ পায় তাহাই করে। ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষু ফুটিতে থাকে। ভগবানের অভিপ্রায় কি, জীবের চরম লক্ষ্য কি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় কি অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা কতকটা দেখিতে পায়, বুঝিতে পারে। তখন সে জ্ঞানপূর্ব্বক, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে। এতদিন তরঙ্গতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সে যে পথে ভাসিয়া যাইতেছিল, আজ স্বাধীন বাষ্পীয় পোতের ন্যায় সেই পথে অগ্রসর হয়। যতই অগ্রসর হয়, ততই গুণত্রয়কে ক্রমশঃ পরাভূত করিতে থাকে। জীব মাত্রই তিনটি গুণেরদ্বারা অভিভূত,—তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। এই গুণত্রয় নিবন্ধনই তাহার অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা৬। এই তিনটি গুণকে করায়ত্ত করিলেই, ইহাদের অধীনতা পাশ

হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই, জীব আপনাকে আত্মা বলিয়া জানিতে পারে। প্রথমে তমোগুণকে জয় করিতে হয়। যেমন শল্যের দ্বারা শল্যের উদ্ধার হয়, সেইরূপ রজদ্বারা তমকে নাশ করিতে হয় এবং সত্বের দ্বারা রজের উচ্ছেদ করিতে হয়। ততঃপর সত্বকেও বিসর্জ্জন দিয়া ত্রিগুণাতীত হইতে হয়। এই অবস্থাতেই আত্মা প্রকাশ পান।

উল্লিখিত তিনটি পথের মধ্যে কর্ম্মমার্গই আমাদের প্রথম আলোচ্য। অধিকাংশ মানবই এই মার্গে অবস্থিত। কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই অন্ধভাবে চলিতেছে, জানে না যে তাহারা কর্ম্মমার্গে আছে, অথবা গন্তব্য স্থানটি কি। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নিয়তই কর্ম্ম করিতেছে। আহারের জন্য, বস্ত্রের জন্য, রমণীর জন্য, ধনের জন্য, মানের জন্য, কীর্ত্তির জন্য, প্রভুত্বের জন্য, বিদ্যালাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, কত নাম করিব, কোন না কোন বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অহরহঃ দিবারাত্র খাটিতেছে, ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে। ইহারা সকলেই কর্ম্মমার্গী। একটি বণিক কোটি কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিতেছে। কেন? পয়সার জন্য? সে আরও চায়। পয়সায় কি হইবে? তাহা হয়ত সে জানে না। কিন্তু তবু সে চায়। অর্থই তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এইরূপে, যেখানে যত লোক খাটিতেছে, অনুসন্ধান করুন, দেখিবেন প্রায় সকলেরই একটা না একটা ফলাকাঙ্ক্ষা আছে।

নিষ্কাম কর্ম্মী খুব কম, নগণ্য। এই যে ফলাকাঙ্ক্ষা ইহা নিন্দনীয় নহে। ক্রমোন্নতির প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োজনীয় ও হিতকর। এই ফলাকাঙ্ক্ষা, এই ভোগ বাসনা না আসিলে জীব আলস্য, তন্দ্রা, জড়তা, মোহ প্রভৃতি তমোগুণকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। এক উলঙ্গ বর্ব্বর আমমাংসে উদরপূর্ণ করিয়া গিরিগুহায় নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিয়া আছে। যদি তাহার পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, সেকি আরাম ত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গলে পশু অন্বেষণে কষ্ট পাইবে? ক্ষুধার তীব্র তাড়নাই, আহারের বাসনাই, তাহার আলস্য ও জড়তাকে নাশ করিয়া তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, তাহার মনোযোগ, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করে। অতএব যেরূপেই হউক প্রথমাবস্থায় জীবের কর্ম্ম করাই চাই। কর্ম্ম ব্যতীত তাহার শরীরই টিকে না, জীবন-ধারণই অসম্ভব হয়। এই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৩।৮

প্রথমে ফলকামনাই জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, উদ্দীপিত করে, উৎসাহিত করে। ফল কামনা ব্যতীত সে কর্ম্ম করিতে পারেনা, কেন করিবে তাহা বুঝিতেই পারে না। জীবের জন্য, ভগবৎসেবার জন্য কর্ম্ম করা যায়, ইহা বুঝা তো অনেক দূরের কথা; সত্যের জন্য বা জ্ঞানলাভের জন্য কেহ কেহ কর্ম্ম করেন, ইহা শুনিলেও সাধা-

রণ ব্যক্তি অবাক্ হয়। সুতরাং ডার্উইন্ প্রভৃতি কেবল সত্যের জন্যই আজীবন বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, ইঁহা তাহারা বিশ্বাস করে না, বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায় ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনা ব্যতীত জীবের দ্বিতীয় কর্ম্মপ্রণোদক নাই। প্রথমে নিকৃষ্ট বাসনাগুলিই তাহার সম্বল হয়। আহার, বিহার, বসন, ভূষণ ও মৈথুনাদির জন্যই সে যাবতীয় কর্ম্ম করে। ক্রমশঃ এই স্থূল বিষয়গুলির মধ্যেও তারতম্যবিচার আরম্ভ হয়। আগে যা পাইত তাহাই খাইত, উদরপূর্ত্তি হইলেই চলিত; এখন ইহা ভাল, ইহা মন্দ, ইহা অনুভব করিতে থাকে। যে কোন রমণী পাইলে সে এখন তৃপ্ত হয় না, সুন্দরীর অন্বেষণ করে। মোটা কম্বলে তাহার মন উঠে না, সুন্দর সৌখীন বনাত ও শাল চায়।

এইরূপে কর্ম্মমার্গে যতই অগ্রসর হয়, তাহার ভোগবাসনা ততই প্রবল হইতে থাকে এবং স্থূল বস্তুগুলি ছাড়িয়া সে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়। তখন আর আহার পরিচ্ছদাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। ধন, মান, যশঃ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি অথবা সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্য, যেমন ছবি, গাড়ী, অট্টালিকা, নানাবিধ আসবাব এবং নৃত্য-গীতাদির প্রতিই অধিকতর অনুরক্ত হয়। এখন, তাহাকে প্রকৃত রজঃপ্রধান বলা যাইতে পারে। অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিবার জন্য তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, এবং অসাধারণ অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, মনোযোগ ও সহিষ্ণুতাদি

পরিলক্ষিত হয়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কিছুতেই ভীত হয় না, পশ্চাৎপদ হয় না। সে ভূগর্ভাদি খনন করিয়া খনিজ পদার্থ আহরণ করে, দুরারোহ পর্ব্বতমালা ও বিশাল বারিধি অতিক্রম করিয়া পরপারে রাজ্যবিস্তার করে, নানাবিধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে, অসংখ্য কল কারখানা নির্ম্মাণ করে এবং কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করে। এই অবস্থায় তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা দুইভাবে প্রকাশ পায়;—১ম পার্থিব ফলের আকাঙ্ক্ষা, ২য় অপার্থিব সুখের লালসা। যে জাতির পরলোকে বিশ্বাস আছে, মৃত্যুর পর আর এক রাজ্যে বাস করিতে হইবে, ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, সে জাতি কেবল পার্থিব ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করে না। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, দান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি সহস্র সহস্র কঠোর কর্ম্ম, হিন্দু নিয়ত সমাপন করেন। কেন? অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখের জন্য নহে, অপেক্ষাকৃত তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী স্বর্গসুখের জন্য। হিন্দু বর্ত্তমান ঐহিক সুখকে কতকটা উপেক্ষা করিয়া, ভবিষ্যৎ পারত্রিক সুখের জন্যই অধিক লালায়িত। কিন্তু যে জাতির পরলোকে শ্রদ্ধা নাই, যাহারা মৃত্যুর পর কিছুই নাই মনে করে, তাহারা পার্থিব ভোগকেই একমাত্র সার বস্তু বলিয়া জানে। "মরিলেই সব ফুরাইল, অতএব যতদিন পৃথিবীতে আছ, যথাসম্ভব সুখভোগ করিয়া লও," ইহাই তাহাদের মত। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিরা ইহার নিদর্শন।

পাশ্চাত্যদেশে পার্থিব ফলের আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে, যে কার্য্যে কোন পার্থিব লাভ হয় না, সে কার্য্য কেহ করিলে সাধারণ লোক তাহাকে বাতুল বা বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করে। পদার্থ বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা যদি ষ্টীম ইঞ্জিন, টেলিগ্রাফ, কাপড়ের কল, সুতার কল প্রভৃতির আবিষ্কার করিতে পার, জ্যোতিষবিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা যদি নাবিকদের সহায়তা করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পার, রসায়ণের দ্বারা যদি এনামেল, dyeing, bleaching প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া শিল্পবাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন করিতে পার, বেশ কথা, খুব অনুশীলন কর, বিজ্ঞানশাস্ত্রে ডুবিয়া থাক, আপত্তি নাই। কিন্তু সৌরজগৎ কিরূপে নীহারিকা (Nebula) হইতে উৎপন্ন হইল, মঙ্গলগ্রহে কি কি পদার্থ আছে, অথবা পরমাণু (atom) কি জড় বা ঘূর্ণী শক্তি (Whirling Energy) এ সকল বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া লাভ কি? এ সকল জানিলে পৃথিবীর কি লাভ? আর না জানিয়াই বা কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে? পাশ্চাত্যদেশে সাধারণ লোকের মনোভাব কতকটা ঐরূপ। সে চায় পার্থিব ফল, পার্থিব সুখ। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই নূতন নূতন ও সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে, ততই স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসিতার দ্রব্য বাড়িতেছে। পদব্রজে গমনাগমন করা কষ্টকর; গরুর গাড়ীর সৃষ্টি হইল। ইহাতে বড়ই বিলম্ব হয়; ঘোড়ার গাড়ী হইল। অধিক দূর যাইতে উহাতে সুবিধা হয় না; রেলগাড়ী আসিল। ইহার বেগ ক্রমশঃ

বাড়িতে লাগিল। ঘণ্টায় ১২০।১৫০ মাইল অবধি হইল। কিন্তু তাহাতেও কি মানবের তৃপ্তি আছে? সে ইলেক্‌ট্রীক গাড়ী বা তদপেক্ষা আরও দ্রুতগামী যান চায়। এইরূপ সকল বিষয়েই। দূরদেশে সংবাদ পাঠাইতে অসুবিধা হইত; চিঠির সৃষ্টি হইল। প্রথমে মানুষের ডাক, পরে ঘোড়ার ডাক। তাহাতেও হইল না। টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, তারহীন টেলিগ্রাফ, টেলিপ্যাথি। ইহাতেও তাহার তৃপ্তি নাই, অসুবিধা বোধ হইতেছে, সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। কেন হইবে? সে যে জিনিষটি চায় তাহা পাইতেছে না, কাজেই তৃপ্তি হইতেছে না। সে প্রকৃত কি চায়, কি ধনের অন্বেষণে সংসারে ঘুরিতেছে, তাহা সে জানে না। তাই ভ্রমক্রমে সে কখনও অর্থের মধ্যে তাহা খুঁজিতেছে, গাড়ীঘোড়ার মধ্যে খুঁজিতেছে, জমী, বাগান, খাট, পালং, যশ, মান বিজ্ঞান, শিল্প—যাবতীয় পার্থিব বস্তুর মধ্যে খুঁজিতেছে। কিন্তু হায়! সে জানে না যাহা অপার্থিব, পার্থিব বস্তুর মধ্যে তাহা নাই। যতই পার্থিব বস্তুকে সে আঁকড়াইয়া ধরিবে, ততই ভোগবাসনা বাড়িবে, তৃপ্তি হওয়া দূরের কথা, অতৃপ্তি শতগুণ বাড়িবে, আকাঙ্ক্ষা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। জীব যখন এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহাকে সতর্ক করিবার জন্যই ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

জীব যখন কর্ম্মমার্গে আর একটু অগ্রসর হয়, যখন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর যাবতীয় বস্তু উপভোগ করিয়া সে বুঝিতে পারে, কিছুতেই তার তৃপ্তি নাই, বরং সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষাই বাড়িতেছে, তখন সে প্রকৃতই বিরক্ত হইয়া উঠে ও মনে মনে বলে, "দূর হ'ক! এই ছাই ভস্ম গুলোই যত অশান্তির মূল! এ গুলোকে দূর করিয়া দিব।" এই ভাবিয়া সে ভোগ্যবস্তুগুলির অন্তরালে কোন নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই সংযম আরম্ভ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সাধক বিষয় ছাড়িলেন, বিষয় তো তাঁহাকে ছাড়ে না! তিনি দেখেন যে তিনি বনেই যান, পর্ব্বতগহ্বরেই থাকুন, বা সাধু-সেবিত দেবালয়েই বাস করুন, ভোগবাসনা পূর্ব্ববৎ বলবতীই রহিয়াছে; সুতরাং তিনি বাহ্যেন্দ্রিয় রোধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মন, বনে বসিয়াও যাবতীয় বিষয় উপভোগ করিতেছে। তখন ভগবানের নিম্নলিখিত শাসনবাক্যটি তাঁহার মনে উদিত হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ গীতা-৩৬

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয়মাত্র রোধ করিয়া মনে মনে বিষয়ভোগ করে, সে ব্যক্তি মূঢ় ও কপট। তখন দারুণ নৈরাশ্যে ও ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হয়। তিনি ভাবেন তবে উপায় কি? বিষয় তো যথেষ্টই

ভোগ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে শান্তি নাই, কেবল অতৃপ্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষাই বাড়ে। আবার বিষয় ছাড়াও যায় না, মন হইতে বিষয়চিন্তা কিছুতেই দূর করিতে পারি না। তবে, এখন উপায় কি ?" জীব যখন এই সমস্যায় পড়িয়াছেন, তখন ভগবান্ বলিতেছেন,—

ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ গীতা—৩।৪

"বৎস, এখনও তোমার কর্ম্মত্যাগের সময় হয় নাই। পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ কর। কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি-লাভ হয় না।"

অতএব, জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এখন একটি নূতন ভাব তাঁহার মনে জাগিতে থাকে। তিনি ভাবেন "আচ্ছা, এতদিন তো কেবল 'আমার' 'আমার' করিয়া মরিয়াছি। যাহা কিছু করিয়াছি, সমস্তই নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য। ধন দৌলত, গাড়ী বাড়ী, বাগান জমী, মানসম্ভ্রম—যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছি, সবই এই ক্ষুদ্র দেহটির বা স্ত্রীপুত্রাদির জন্য। কিন্তু হায়, চতুর্দ্দিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক কতই কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের দুঃখ কি দুঃখ নহে ? কই, তাহাদের কথা তো একবারও ভাবি না, তাহাদের দিকে তো ফিরিয়াও তাকাই না ! আমার যদি একদিন আহারের সামান্য ত্রুটি হয়, যদি ক্ষীরে একটু চিনি কম হয়, কতই কাতর হই, কিন্তু সহস্র দরিদ্র ভিক্ষুক—যাহাদের দিনান্তে একমুষ্টি অন্নও জুটে না—

তাহাদের জন্য তো একটুও কাতর হই না। যদি আমার "কাশ্মীয়ার অলষ্টারটির" এক কোণে সামান্য দাগ ধরে, তৎক্ষণাৎ এক নূতন "অলষ্টারের" জন্য আদেশ করি, কিন্তু নগ্নপদ, নগ্নগাত্র, ছিন্নকন্থামাত্রসার, শীতে মৃতপ্রায় শতশত দীন দরিদ্রের জন্য কি করি? আমার পুত্রের সামান্য পীড়া হইলে "সিবিল সার্জ্জন" আনাই এবং শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করি, কিন্তু দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি দুরন্ত ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া অকালে কালগ্রাসে যাইতেছে, তাহাদের জন্য কি একবারও ভাবিয়া থাকি? আমি কি কেবল নিজের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি? এই ক্ষুদ্র দেহরক্ষাই কি কেবল আমার কর্ত্তব্য? সমগ্র পৃথিবীই কি আমার কর্ম্মক্ষেত্র নহে? দেশের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য, আমি কি কিছুই করিব না?" যখন জীবের এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তখন তিনি নবোদ্যমে, নূতন উৎসাহে, পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এখন তাঁহার লক্ষ্য—নিজের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা নহে, সমগ্র মানবের মঙ্গল-বিধান। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন, যেরূপ উৎসাহ, যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন সেইরূপ যত্ন, সেইরূপ উৎসাহ, সেইরূপ উদ্যম পরার্থে নিয়োজিত করেন। জীবের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিতেছেন,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তঃ চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩।২৫

অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া (নিজের জন্য) যেরূপে কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া মানব-জাতির জন্য সেইরূপে কর্ম্ম করেন।

জীব যখন এইরূপে অপরের জন্য,—মনুষ্যজাতির জন্য কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন, তখনও তাঁহার মধ্যে একটি ফলাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্মভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। তিনি অন্য কিছু না চাহিলেও, হয়ত দশজনে তাঁহার সুখ্যাতি করে, তাঁহার কাজের প্রশংসা করে, এটা তিনি চান। অথবা, এ আকাঙ্ক্ষাও যদি না থাকে যদি লোকের স্তুতি নিন্দাকে সমান জ্ঞান করেন, তথাপি তাঁহার কর্ম্মটি সফল হয়, অন্ততঃ এ বাসনাও তাঁহার অন্তরে থাকে। তিনি হয়ত কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিতে যত্ন করিতেছেন, বা অন্য কোন লোকহিতকর কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন; যদি কার্য্যটি সফল হয় তিনি আনন্দ লাভ করেন, এবং যদি তাঁহার সকল শ্রম পণ্ড হয়, যদি সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তিনি নিরানন্দ ও দুঃখিত হন। ইহাতে বুঝা যায় এখনও তাঁহার ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু ফল কামনা সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলে, জীবের মুক্তি নাই, কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বুঝিতে হইবে তাঁহার একটা পৃথক্ আমিত্ব বোধ আছে, 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা',—ইত্যাকার জ্ঞানটি বজায় রহিয়াছে। ইহাই অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া। ইহা না গেলে আত্ম দর্শন হয় না, সুতরাং এই অবস্থায় ভগবান জীবকে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২।৪৭

"কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে অধিকার নাই। ফললাভ করিব ভাবিয়া কর্ম্ম করিও না, অথচ কর্ম্ম ত্যাগ করিতেও যেন ইচ্ছা না হয়।" পুনশ্চ,—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২।৪৮

"অনাশক্ত ও যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। যোগস্থ কি? কর্ম্ম সফলই হউক, বা বিফলই হউক, তুল্য জ্ঞান করিবে, এই তুল্য জ্ঞানের নামই যোগ।"

দুএকটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। মনে করুন একব্যক্তির পুত্রের কঠিন পীড়া। তিনি প্রাণপণ যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেছেন। পুত্রটি আরোগ্য লাভ করিল। ভালই। পুত্রের মৃত্যু হইল। ভালই। পুত্রের আরোগ্যে তাঁহার আনন্দ নাই, পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার বিষাদ নাই। কারণ, ফলাফলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে না, ফলাফলের বিষয় আদৌ ভাবিবেন না। তাঁহার সমগ্র লক্ষ্য, সমগ্র মনোযোগ, কার্য্যটির দিকে। "ইহাই আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য, ইহাই আমি প্রাণপণে করিব। ফলাফল যাহাই হউক, যাঁহার কার্য্য তিনিই বুঝিবেন। আমি তো তাঁর একটি যন্ত্র স্বরূপ। যন্ত্র কেবল কর্ম্ম করিয়া যাইবে। ফলাফলের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? সে সব যন্ত্রী বুঝিবেন।

একটা কলম দিয়া যখন কেহ লিখেন, লেখার ফল ভালই হউক, আর মন্দই হউক, লেখকই বুঝিবেন। কলম কেবল লিখিয়া যাইবে।” এই ভাবে তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে৮।

আবার মনে করুন, আপনার গ্রামের উন্নতির জন্য আপনি প্রাণপণে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া সকলে লেখাপড়া শিখিতে পারে, চিকিৎসালয় ও রাস্তা ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয়, লোকে ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও নীতিপরায়ণ হয়, ইত্যাদির জন্য, আপনি সমগ্র অবসর, অর্থ ও দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা আপনার সাধু উদ্দেশ্য বুঝিল না। কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, তাহারা আপনার প্রতি; স্বার্থ-পরতা, নীচতা প্রভৃতির আরোপ করিয়া, আপনার নিন্দা কবিতে লাগিল, আপনার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। আপনি তিলমাত্র দুঃখিত ও বিচলিত না হইয়া পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিতে থাকিবেন। আবার, হয়ত তাহারা আপনাকে দেবত্বে উত্তোলিত করিল, নরদেবতা বলিয়া আপনার পূজা করিতে লাগিল। ইহাতেও আপনি কণামাত্র উল্লসিত বা আনন্দিত হইবেন না। ফলাফলের প্রতি আপনার দৃষ্টিই থাকিবে না, কার্য্যের প্রতিই লক্ষ্য। আপনি ‘তুল্যনিন্দাস্তুতি’। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য, মান অপমান, মধুর বাক্য কঠোর বাক্য, রাজপ্রাসাদ পর্ণকুটীর, পট্টবস্ত্র বল্কল, আপনার নিকট তুল্য। আপনি আজ অট্টালিকায় বসিয়া ক্ষীর নবনীতে

দেহপুষ্টি করিতেছেন। ভালই। কল্য আপনাকে এক জীর্ণ কুটীরে বৃক্ষপত্র খাইয়া থাকিতে হইল। ভালই। আজ আপনি সম্মানিত, পূজিত, সহস্র দাস-দাসী-সেবিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে শায়িত; কল্য আপনাকে ছিন্নবস্ত্র পরিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া একমুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দ্বারে দ্বারে যাইতে হইল। ভালই। "সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যে ভাবে রাখিবেন, যে ভাবে কর্ম্ম করাইবেন, আমি সানন্দে সেই ভাবেই থাকিব, সেই পথেই চলিব। বলদের স্বামী বলদকে মণিমুক্তায় সাজাইয়া দেবভোগ্য চন্দন পুষ্পাদি বহন করাইতে পারেন, অথবা পঙ্কিল কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্যদিয়া বিষ্ঠার গাড়ী টানাইতে পারেন। ইহা স্বামীর ইচ্ছা। বলদের কাজ—বোঝা বহা, প্রাণপণে মনিবের কাজ করা, যে কাজই হউক।" এইরূপ ভাবিতে হইবে।

এই অবস্থায় জীবের মমত্ব একবারেই তিরোহিত হয়। "ইহা আমার কাজ, উহা তোমার কাজ, বা এটা আমার জিনিষ, ওটা তোমার জিনিষ"—এ জ্ঞান আর থাকে না। তখন সমস্ত কাজই তাঁর কাজ, সমস্ত দ্রব্যই তাঁর দ্রব্য। জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তিনি যেন ভগবানকে দেখিতে পান, ভগবানের নির্দেশ শুনিতে পান। প্রয়োজন হইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি রামচন্দ্রের ন্যায় রাজমুকুট ছাড়িয়া সহর্ষে জটাবল্কল ধারণ করিতে পারেন, বুদ্ধদেবের ন্যায় প্রমোদ-কানন ছাড়িয়া ভীষণ কাননে প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ, যিনি

এতদিন তাঁহাকে রাজা সাজাইয়া কোন কার্য্য করাইতে-ছিলেন, তিনিই আজ তাঁহাকে ফকির সাজাইয়া কার্য্যান্তরে পাঠাইতেছেন,—ইহা তিনি পরিষ্কার দেখিতে পান। যতদিন রাজ্য তাঁহার হাতে থাকে, তিনি প্রাণ-পণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক কার্য্য সম্পন্ন করেন বটে, কিন্তু তিনি নিশ্চিত বুঝেন "ইহা আমার নহে, ইহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধই নাই।" সুতরাং জনক রাজার ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন,—

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং নমে দহতি কিঞ্চন॥

"অহো! আমার অনন্ত ধনসম্পদ্! কারণ প্রকৃত-পক্ষে আমার কিছুই নাই। সমগ্র মিথিলা ভস্মীভূত হইলেও আমার কিছুই পুড়িবে না।"

জীব এখন কর্ম্মমার্গের এরূপ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, যেখানে তিনটি মার্গই মিলিত প্রায়। সুতরাং এখন জ্ঞান ও ভক্তি তাঁহার অন্তরে পূর্ণভাবে উদিত হয়। তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু স্বতই উন্মীলিত হইয়া যায়, তিনি সেই দিব্যনেত্রে অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে পান। তিনি দেখেন সর্ব্বত্রই তিনি, সবই তিনি। জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, বৃক্ষ-লতায়, পশুপক্ষীতে, কীটপতঙ্গে, নরনারীতে, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে, যক্ষ-রক্ষে, দেবতা-অসুরে,—সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজিত। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, তিনিই অসংখ্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত, নানামূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিতেছেন। এই

লীলার নাম ত্যাগ। সর্ব্বাগ্রে তিনি আপনাকে সমষ্টি ভাবে বলি দিয়াছেন,—তারপর ব্যষ্টিভাবে বলি দিতেছেন। এই ত্যাগের উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগের দ্বারাই জগৎ চালিত৯। তিনি বিরাটমূর্ত্তিতে এই ত্যাগ করিতেছেন, আবার কোটি কোটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতেও এই ত্যাগ করিতেছেন। তিনি প্রস্তররূপে আপনাকে বলি দিয়া বৃক্ষলতার আহার যোগাইতেছেন, বৃক্ষরূপে বলি দিয়া পশু পক্ষী মানবাদির পুষ্টিসাধন করিতেছেন, মাতৃরূপে বলি দিয়া সন্তানের, গুরুরূপে বলি দিয়া শিষ্যের, রাজা রূপে বলি দিয়া প্রজার এবং ব্যক্তিরূপে বলি দিয়া সমাজের কল্যাণবিধান করিতেছেন। তিনি আপনার এক মূর্ত্তির ধ্বংস করিয়া অপরমূর্ত্তির পুষ্টিসাধন করিতেছেন। এই সংসার একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষস্বরূপ। এই বৃক্ষের মূলও তিনি, কাণ্ডও তিনি, শাখাও তিনি, প্রশাখাও তিনি, পল্লবও তিনি, পত্রও তিনি, পুষ্পও তিনি, ফলও তিনি। একই রস মূল হইতে কাণ্ডে, কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখায়, শাখা প্রশাখা হইতে পল্লব পত্রে, পল্লব পত্র হইতে পুষ্পফলে সঞ্চরণ করিয়া সমগ্র বৃক্ষটিকে সজীব রাখিয়াছে। একই প্রাণ (আত্মা বা চৈতন্য) ব্রহ্ম হইতে ঈশ্বরে, ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মায়, ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি ও মানসপুত্রে, মানসপুত্র হইতে মনু ও ইন্দ্রাদি দেবতায়, ইন্দ্রাদি হইতে ঋষি ও মহাপুরুষে এবং তথা হইতে মানব, পশু, বৃক্ষাদি চরাচরে, প্রবাহিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। কাণ্ড যে রসটি পাইতেছে তাহা দিতেছে শাখাকে, শাখা

প্রশাখাকে, প্রশাখা পল্লবকে, পল্লব পত্রকে, পত্র পুষ্পকে, পুষ্প ফলকে। যে যাহা পাইতেছে সে তাহা দিতেছে, ত্যাগ করিতেছে। সকলেই এক এক বাহক বা প্রেরক। সকলেই এক একটি প্রণালী (channel) স্বরূপ।

যখন জীব দিব্যনেত্রে উক্তরূপ দেখিতে পান, উক্ত ভাব উপলব্ধি করেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি বলেন, "আহা, আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমি সেই অনন্ত-প্রাণের একটি ক্ষুদ্র প্রণালী (channel) হইয়াছি। আজ আমার ভিতর দিয়া সেই প্রাণ স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। যাহা ভাবিতেছি,—সমস্তই তাঁহারই ক্রিয়া, তিনিই এই দেহ ও মন আশ্রয় করিয়া লীলা করিতেছেন। আমি ধন্য হইয়াছি।" এইভাবে তিনি এখন বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই এখন ত্যাগ। তাঁহার পৃথক্ আমিত্ব জ্ঞান আর নাই, অনন্ত আত্মাই এখন তাঁহার ভিতর দিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি শান্তি পাইয়াছেন। কারণ,—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ গীতা ২।৭১

যিনি সকল কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার, "আমি," "আমার" ইত্যাদি বোধশূন্য, অতএব নির্ম্মম হইয়া ভোগ্য বিষয়সমূহে মমত্ব বোধশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনি শান্তি-প্রাপ্ত হন।১০

সাধক শাস্ত্র-বচন।

(১) ভক্ত সাধক উদ্ধবকে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ ৬
নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ৭
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ৮
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ৯
স্বধর্ম্মস্থো যজন যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ ১০
অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ১১ ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১ স্ক, ২০ অ।

মনুষ্যগণের মঙ্গলসাধনেচ্ছায় আমি তিন প্রকার যোগ কহিয়াছি;—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এতদ্ভিন্ন কল্যাণ সাধনের অন্য কোন উপায় কুত্রাপি কাহারও দ্বারা উক্ত হয় নাই। তপস্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি কর্ম্মসকল পৃথক উপায় নহে; কারণ, উহারা জ্ঞান বা ভক্তির অন্তর্ভূত হইয়াই মোক্ষফল বা প্রেমফল প্রদান করিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমাচাররূপ কর্ম্মও যখন

পরমেশ্বরে অর্পিত হয়, তখন উহা তপোযোগাদির ন্যায় জ্ঞান বা ভক্তির অন্তর্ভূত হইয়া যায়। এই তিনটি ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। অধিকারীর ভেদ বশতঃ উপায়ের ভেদ উক্ত হইয়া থাকে। এই যোগত্রয়ের মধ্যে দুঃখ বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে বিরক্ত, অতএব ফলপ্রদ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মত্যাগকারী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই অভীষ্ট ফল প্রদান করে; এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে দুঃখ-বুদ্ধি শূন্য, অতএব কর্ম্ম ও তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগই অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়। আর কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যে সংসারিক সুখদুঃখ-প্রদ কর্ম্মে বিরক্তিরহিত, অথচ সেই সেই কর্ম্মে অত্যা-শক্তি শূন্য, তাহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন না আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধাজন্মে; ততদিন চিত্ত শুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল আচরণ করিবে। হে উদ্ধব, ফলকামনারহিত স্বধর্ম্মস্থব্যক্তি যদি বিহিত কর্ম্ম অতিক্রম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ না করিয়া, যজ্ঞাদি দ্বারা যজন করে, তাহা হইলে তাহাকে ফলকামনার অভাব হেতু স্বর্গে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণ হেতু নরকেও গমন করিতে হয় না। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী শুদ্ধ-চিত্ত, স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমানে থাকিয়া, বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ লাভ করিয়া মুক্তিলাভ প্রাপ্ত হন, অথবা ভাগ্যবশতঃ আমাতে ভক্তিলাভ করেন।

(২) নিঃস্বোহেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।

চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ ॥

শিহ্লন মিশ্র কৃত "শান্তিশতক"।

নিঃস্ব ব্যক্তি একশত চায়, যাহার একশত আছে সে সহস্র চায়, যাহার সহস্র আছে সে একলক্ষ চায়, লক্ষাধিপ রাজত্ব চায়, রাজা চক্রেশ্বর হইতে অভিলাষ করে, চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্ব চায়, ইন্দ্র ব্রহ্মা হইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ আকাঙ্ক্ষা করেন! এইরূপে মানবের আশার অবধি নাই।

(৩) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডারউইন সাহেবই যে ক্রমবিকাশবাদ জগতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরও অনুমোদিত। তবে এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ২য় অংশে ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥

বৃ, বিষ্ণু, পুঃ।

জীব বিংশতি লক্ষ স্থাবর যোনি, নবলক্ষ মৎস্যযোনি, নবলক্ষ কুর্ম্মযোনি, দশলক্ষ পক্ষীযোনি, ত্রিশলক্ষ পশুযোনি চারিলক্ষ বানর যোনি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যযোনি লাভ করতঃ কর্ম্ম সাধন করে। পূর্ব্বোক্ত যোনি সমূহে ভ্রমণ করিয়া, দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, অতঃপর সমস্ত যোনি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

(৪) মমৈবাংশোজীবলোকে জীব ভূতঃ সনাতনঃ।
গীতা ১৫ অঃ—৭ শ্লোঃ।

এই জীবলোকে যত জীব আছে, তৎসমস্তই আমার অংশ, সুতরাং উহা সনাতন।

ত্রিধৈকপাচ্চরেদ্ ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে।
সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মন॥
মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, ৭—১১

ব্রহ্মের একপাদ সৃষ্টি, আর তিনপাদ সৃষ্টির অতীত। তিনি সত্য ও অনৃত যুগপৎ উপভোগ করিবেন বলিয়া এইরূপে দ্বৈত হইয়াছেন।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥
ভাগবত ৩।২৯।২৯

এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।

(৫) অজ্ঞ জীবের পক্ষে আবার সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি যে সম্ভবপর, এবং তাহার জন্যই যে তাহার জন্মান্তর গ্রহণ এ কথাও শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন ; যথা,—

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।
জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—১।৬

সর্ব্বজীবের জীবন ও লয় স্থান যে ব্রহ্মচক্র, সেই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রেই অজ্ঞ জীব পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকেন। যতদিন জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদদর্শন, ততদিন তাঁহার এই গতায়াত ; কিন্তু অভেদদর্শন হইলেই তাহার গতায়াত শেষ হয়।

এক দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণের কারণই তাহা ;—

তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বান্যেষাং বা ভূতানাম্।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৪

যেমন স্বর্ণকার সেই এক স্বর্ণেরই অংশ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নূতন নূতন রচনার পারিপাট্য অনুসারে অভিনব সুন্দর সুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ

করে, তদ্রূপ সংসারী আত্মাও এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করাইয়া ঐ পঞ্চভূত দ্বারাই রচিত, অভিনব ও কল্যাণতর দেবলোকোপযোগী দৈব, পিতৃলোকোপ-যোগী পৈত্র্য, মনুষ্যলোকোপযোগী মানুষ, গন্ধর্বলোকোপ-যোগী গান্ধর্ব্ব, প্রজাপতিলোকোপযোগী প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম বা অপর প্রাণী সকলের আকার ধারণ করিয়া থাকেন।

(৬) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪।৫

হে মহাবাহো, প্রকৃতির তিনটি গুণ বা শক্তি আছে, একটির নাম সত্ত্ব, আর একটির নাম রজ, আর একটির নাম তম। এই তিনটি গুণই রজ্জুর ন্যায় মিলিত হইয়া নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, সমস্ত বিকার শূন্য আত্মাকে এই দেহমধ্যে অভিসম্বদ্ধ করে।

আবার সত্ত্বাদি গুণ জয় সম্বন্ধেও উক্ত আছে :—
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি॥ ১
ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে॥ ৩
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৩

হে উদ্ধব, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, অতএব সত্ত্ব বৃত্তির দ্বারা রজঃ তমঃ গুণের বৃত্তিকে জয় করিবে; পরে সত্ত্বদ্বারাই সত্ত্বকে জয় করিবে।

যাহাতে অত্যাত্তম সত্ত্ববৃদ্ধি হয়, তাদৃশ ধর্ম্ম রজঃ তমঃ গুণকে বিনাশ করে। অধর্ম্মের মূলীভূত রজঃ তমঃ গুণ বিনষ্ট হইলে, তৎকার্য্য অধর্ম্ম শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

(৭) নকর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩ অঃ

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; (চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত) কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি লাভ হয় না। কোন অবস্থায়, ক্ষণমাত্র জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; রাগ দ্বেষাদি স্বভাবিক গুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা হয়।

সেই অমূল্য গ্রন্থের অন্যত্রে আছে,—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১৮।১১

দেহাভিমানী জীবগণ সম্পূর্ণরূপে সকল কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি (সকল কর্ম্ম করিয়াও) কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী নামে অভিহিত হন।

(৮) যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৯

ঈশ্বরার্থে কর্ম্মব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে মানব কর্ম্মে বদ্ধ হয়, অতএব হে কৌন্তেয়, নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম কর।

(৯) যজ্ঞের উপর সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত,—

ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।১।১

যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তকেই উষা। উষাই ব্রহ্মার সৃষ্টির আরম্ভ; এই যজ্ঞীয় অশ্ব হইতে দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব, ইত্যাদি উদ্ভূত হইল।

আবার ঋক্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে সেই কথাই আর এক ভাবে আছে। তথায় যজ্ঞে পুরুষের বলিদানের কথা উক্ত আছে।

আবার শতপথ ব্রাহ্মণে সুন্দরভাবে তাহারই উল্লেখ দেখা যায়।

ব্রহ্ম বৈ স্বয়ম্ভুস্তপোঽতপ্যত।
তদৈক্ষত ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি হন্ত অহংভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি ভূতানি চ আত্মনি ইতি।
তৎসর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা ভূতানি চ আত্মনি।
সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রেষ্ঠত্বং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যৈৎ।

শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৭।১

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি বিচার করিলেন যে, তপস্যায় অনন্ত ফল নাই। অতএব আমি ভূতসমূহে আপনাকে আহুতি প্রদান করি, এবং ভূতগণকে আপনাতে আহুতি প্রদান করি। তিনি সমস্ত ভূতে আপনাকে আহুতি দিয়া, এবং সমস্ত ভূতকে আপনাতে আহুতি দিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ করিলেন।

পুরুষসূক্তে পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান বলিয়াছেন,—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১০।৪২

আমি সমস্ত জগৎ, আমার একাংশমাত্রদ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন কিরূপে যজ্ঞের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ঐ ৩।১০

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহিত প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর; ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক।

(১০) তাহা কিরূপ, গোপাল তাপনী উপনিষদে আছে,—

যোঽবৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।
যোঽবৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামো ভবতি।

যে ব্যক্তি ভোগাভিলাষী হইয়া বিষয় ভোগ করে, তাহাকেই বিষয়ী বলা যাইতে পারে; কিন্তু যিনি নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল অপরের-মঙ্গলার্থে শুদ্ধ আনুকূল্যময় প্রেমের বশীভূত হইয়া নিজে বিষয়ভোগ অঙ্গীকার করেন, তিনি কি জন্য বিষয়ভোগী হইবেন।

২। জ্ঞান-মার্গ।

এখন আমরা জ্ঞান-মার্গ সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তিনটি পথের মধ্যে এই পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এই পথে গমন করিবার যোগ্য। ইহা সাধারণের পথ নহে। ইহাতে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, পতনের সম্ভাবনা আছে। এই মার্গে যেরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা, মানব পদে পদে যেরূপ ভুল করে, কি কর্ম্ম মার্গে, কি ভক্তি মার্গে, কোন মার্গেই সেরূপ সম্ভাবনা নাই।[১] এই জন্যই এই পথের যাত্রী-দিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। এখন ধারাবাহিক ক্রমে পথটি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করা যাক্।

যেমন ইন্দ্রিয়-লালসা ও ভোগ-বাসনা হইতে কর্ম্ম-মার্গের আরম্ভ, সেইরূপ জ্ঞান-পিপাসা হইতেই জ্ঞান-মার্গের সূত্রপাত। সকল দেশে ও সকল কালে এরূপ কতকগুলি লোক দেখা যায়, জ্ঞানলাভই যাঁহাদের জীবনের ব্রত, সত্যানুসন্ধানই যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য। তাঁহারা ধন চান না, মান চান না, যশঃ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, প্রতিপত্তি, কিছুই চান না; চান কেবল জ্ঞান, চান কেবল সত্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, ক্রমাগত, আজীবন, তাঁহারা প্রিয়তম অনুসন্ধান কার্য্যে নিমগ্ন হইয়া আছেন, বিভোর হইয়া আছেন; তাহাতেই

তাঁহাদের আনন্দ, নবাবিষ্কৃত সত্যের বিমল জ্যোতিই তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার। কেহ ভূ-পঞ্জরের স্তরে স্তরে সঞ্চিত কঙ্কালরাশির পরীক্ষা পূর্ব্বক পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন; কেহ ভাষা-তত্ত্ব হইতে মানবের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আবিষ্কার করিতে যত্নবান; কেহ তারানক্ষত্রাদির গতিবিধি ও অবস্থা নির্ণয় কর্য্যে আজীবন বিভোর হইয়া আছেন। কেহ বা নানা-জাতীয় উদ্ভিদের গুণাগুণ নির্ণয়ার্থ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা কার্য্যেই ব্যস্ত। এইরূপ কেহ গণিত, কেহ পদার্থ-বিজ্ঞান, কেহ প্রাণি-তত্ত্ব, কেহ শিল্প-তত্ত্ব, কেহ দর্শন প্রভৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ়তম রহস্য জানিবার জন্য, দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাই জ্ঞান মার্গের প্রথম সোপান, এই খানেই জ্ঞান-মার্গের আরম্ভ।

এই যে জ্ঞান-পিপাসা, এই যে সত্য-জিজ্ঞাসা, এটি অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হওয়া চাই। কোন অন্যতর উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত বা সংমিশ্রিত থাকিলে চলিবে না। অনেকে ধন, মান, যশঃ, অথবা নিজের বা জগতের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য জ্ঞানার্জ্জন ও সত্যানুসন্ধান করেন। জ্ঞান লাভ ইহাঁদের গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য ধন মান, বাণিজ্যাদির সুবিধা। কোন নূতন বাষ্পযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অর্থ বা খ্যাতিলাভ করিব ইহা ভাবিয়া যিনি শব্দ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, লৌহজাত পদার্থের উৎকর্ষ বিধানার্থ যিনি রসায়নের চর্চ্চা করেন, অথবা রেলগাড়ী, কল, কারখানা প্রভৃতির উন্নতির জন্য যিনি

তড়িৎ-বিজ্ঞানে নিমগ্ন, তাঁহারা দেশের বা পৃথিবীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও প্রকৃত জ্ঞান-মার্গী, ইহা বলা যায় না। কেবল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান, সত্যের জন্যই সত্য, ইহাই জ্ঞান-মার্গীর লক্ষণ। অবশ্য, সে জ্ঞানের বা সত্যের অবান্তর ফল অনেক হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই, সে কথা মনেও আসে না। তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞান; তাহা পাইলেই তিনি পরিতুষ্ট, চরিতার্থ।

দু'একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্ঞান-পিপাসু দৃষ্ট হন। কিন্তু বোধ করি, প্রাচীন ভারতে ইহাঁদের সংখ্যা যেরূপ ছিল, সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ঋষি মনীষীগণের কোন ইতিহাস বা জীবন-চরিত আমরা পাই নাই; সুতরাং তাঁহাদের একনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণতা, তন্ময়তা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও সাহস কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা নভঃস্পর্শী দুরারোহ, পর্ব্বত সদৃশ জ্ঞানের যে বিশাল স্তূপ রাখিয়া গিয়াছেন; যে উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, অর্থ-নীতি, রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, বিশ্ব-বৃত্তান্ত রাশিকৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের জ্ঞাননিষ্ঠার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, তাহাই শতমুখে তাঁহাদের সত্যপিপাসা ঘোষণা করিতেছে। প্রাচীন ভারতের কথা ছাড়িয়া, আধুনিক যুগেও আমরা এখানে যেরূপ নিষ্কাম জ্ঞান-নিষ্ঠা দেখিতে পাই তাহাও সামান্য নহে। শত শত

হিন্দু আজও জীর্ণ কুটীরে বাস ও শাকান্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনায় নিবিষ্ট ও বিভোর হইয়া আছেন। অনেক সময় দিবারাত্রি কখন চলিয়া যায়, তাঁহাদের জ্ঞান থাকে না। কথিত আছে, এইরূপ একটি নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে এক রাজা তাঁহার সভায় একদা আহ্বান করিয়াছিলেন। দু'একটী কথার পর রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু অসঙ্গতি আছে কি?" পণ্ডিত বলিলেন, "না মহারাজ, যা দু'একটি অসঙ্গতি ছিল, তাহার মীমাংসা করিয়াছি; বর্ত্তমানে সবই সুসঙ্গত হইয়াছে।" রাজা দেখিলেন, পণ্ডিত বাহ্যজগতে নাই, ন্যায়শাস্ত্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তখন আরও স্পষ্ট করিয়া তাঁহার টাকা কড়ির প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত হৃষ্টচিত্তে জানাইলেন, তাঁহার কোন অভাবই নাই, গৃহিণী তাঁহাকে প্রত্যহ যে অন্ন ও তেঁতুল পাতার ঝোল রাঁধিয়া দেন, তাহাতেই তিনি পরম পরিতোষ লাভ করেন। এরূপ পাণ্ডিত্যকে আজকাল অনেকে সময়ের অপব্যয় বলিয়া নিন্দা করেন। তাঁহারা বলেন, এই অসাধারণ বুদ্ধি ও একাগ্রতা অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হইলে, জগতের প্রভূত উপকার হইতে পারিত। হইতে পারে; কিন্তু যেরূপ দৃঢ়তা, তন্ময়তা, অধ্যবসায় ও সর্ব্বত্যাগ পূর্ব্বক ইহাঁরা কেবল জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান-চর্চ্চা করেন, তাহা যে একান্তই প্রশংসার্হ তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।

পাশ্চাত্য জগতেও জ্ঞান-পিপাসার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক, আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকা-খণ্ডে জ্ঞান-নিষ্ঠা ও সত্যানুসন্ধান এতই প্রবল, এতই অধিক যে বর্ত্তমান ভারত তাহাদের নিকট পরাস্ত। ঋষি-বংশধরদিগের পক্ষে ইহা অবশ্য গৌরবের বিষয় নহে ; কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা। পাশ্চাত্য দেশে শত সহস্র ব্যক্তি আজকাল স্থূল জগতের রহস্য নির্দ্ধারণের জন্য যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও একাগ্রতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্যের জন্য, তাঁহারা জীবনের আশা ছাড়িয়া, চিরতুষারাবৃত মেরু-প্রদেশে জাহাজ চালাইতেছেন ; নিবাত নিস্তব্ধ অত্যুচ্চ শূন্য প্রদেশে অকুতোভয়ে উড্ডীন হইতেছেন ; অতলস্পর্শী ভীষণ বারিধির কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া, ধন মান ভুলিয়া, সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া, প্রকৃত যোগীর ন্যায়, একমনে, এক ধ্যানে, নিজ নিজ বিষয় লইয়া নিমগ্ন হইয়া আছেন। কেহ শরীর-তত্ত্ব, কেহ রসায়ন, কেহ ভূ-তত্ত্ব, কেহ প্রাণি-তত্ত্ব, কেহ প্রত্ন-তত্ত্ব, কেহ জ্যোতিষ এবং কেহ বা মন-স্তত্ত্ব লইয়া বিভোর রহিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল, নিত্য নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার ও প্রাচীন জীর্ণ, ভ্রান্ত মত গুলির সংস্কার ও অপনোদন। প্রকৃতিকে যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, যতই তন্ন তন্ন করিয়া, প্রশ্ন করা হইতেছে, প্রকৃতিও ততই সদুত্তর দিতেছেন। কেনই বা না দিবেন? ইহাঁরা তো ছাড়িবার পাত্র নন।

একবারে উত্তর না পাইলে, দশবার, শতবার, সহস্রবার প্রশ্ন করিতেও ইহাঁরা কাতর হন না। ইহাঁদের প্রণালীকে আরোহী প্রণালী Inductive Method বলে। লর্ড বেকন ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাদ্বারা বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে হয়; সুতরাং ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন। মনে করুন, আমি একদিন দৈবাৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম তাপ দিলে লৌহ আয়তনে বাড়ে। তখন আমার মনে প্রশ্ন উঠিল, "আচ্ছা তাম্র বাড়ে কি? রৌপ্য বাড়ে কি? দেখা যাক্"। এই বলিয়া আমি প্রত্যেক ধাতুকে তাপ দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পরিচিত সকল ধাতুই তাপে বাড়ে। সুতরাং আমি একটি সাধারণ নিয়ম বা বিধি অনুমান করিলাম, "তাপ দিলে হয়ত সকল বস্তুই আয়তনে বাড়ে।" এই অনুমান বা Hypothesisটিকে সত্য ধরিয়া লইয়া আমি পুনরায় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং যখন দেখিলাম যাবতীয় বস্তুর পক্ষে এই নিয়মই খাটে, একটির পক্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না, তখন আমি একটি সামান্য বিধি,—General Law—স্থাপন করিয়া বলিতে পারি, "তাপ দ্বারা সকল বস্তু আয়তনে বাড়ে।" ইহারই নাম আরোহী প্রণালী। এই প্রণালীর দ্বারাই আধুনিক বিজ্ঞানের ঈদৃশী উন্নতি।

এইরূপে যাঁহারা সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন।

ডারুইনের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ইনি পাশ্চাত্য জগতে অভিব্যক্তি-বাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং উদ্ভিদ পশু ও মানবের ক্রম বিকাশ ইহাঁকে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। এক সময়ে হয়ত এক শ্রেণীর বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বিভিন্ন ভূমিতে তাহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, আলোক ও উত্তাপের তারতম্যে কিরূপ বিকার ঘটে, বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন বায়ুতে কোন ইতর বিশেষ হয় কিনা, ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। হয়ত একই পরীক্ষা বিংশতিবার, শতবার করিতে হইয়াছে। আর শুধু কি বৃক্ষ? পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী সম্বন্ধে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! অধীরতা নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই! সত্য বাহির করিবেই করিবে, তাহা যেখানেই লুক্কায়িত থাকুক, তাহাকে দেখিতেই হইবে। তাহার দর্শনেই জীবন ধন্য, চরিতার্থ। ইহাই ইহাঁদের জীবনের মন্ত্র। ইহাঁদের একাগ্রতা কিরূপ অসাধারণ নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। আমেরিকার এডিসনের নাম অনেকের সুপরিচিত। ইনিই গ্রামোফনের আদি সৃষ্টি-কর্ত্তা। একদা তিনি এক বন্ধুর সহিত স্থানান্তরে গমন করেন এবং রাত্রিকালে এক হোটেলে আশ্রয় লন। হোটেলের প্রকাণ্ড সুবিস্তৃত হল, তড়িৎ-আলোকে আলোকিত। শত শত ব্যক্তি চারিদিকে বসিয়া আহার বিহার, গীতবাদ্য ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। বন্ধুদ্বয় এইখানেই

উপবেশন করিয়া অভীষ্ট খাদ্য আনিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু ইতি মধ্যেই এডিসন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, একটা গভীর চিন্তায় যেন ডুবিয়া গেলেন। দৃষ্টি স্থির, চক্ষুর পলক নাই, মস্তক মাঝে মাঝে ঈষৎ সঞ্চালিত, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান একেবারেই তিরোহিত। তাঁহার মধ্যে মধ্যে এরূপ ভাবান্তর হইত, বন্ধু অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি এডিসনের ধ্যান ভঙ্গ না করিয়া স্বয়ং আহারাদি সমাপন করিলেন। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা করিয়া রাত্রি অনেক হইল, অন্যান্য ব্যক্তিগণ শয়নগৃহে চলিয়া গেলেন, হল নীরব হইল। এডিসন সেই ভাবেই বসিয়া আছেন। তখন বন্ধু কৌতুক দেখিবার জন্য এডিসনের সম্মুখস্থ টেবিল হইতে অস্পৃষ্ট খাদ্যগুলি লুকাইয়া রাখিয়া নিজের ভুক্তাবশেষ তথায় রাখিয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পরে এডিসনের চেতনা হইল। সম্মুখস্থ টেবিলে ভুক্তাবশেষ দেখিয়াই তিনি ভাবিলেন, তাঁহার আহার হইয়াছে, সুতরাং পকেট হইতে রুমাল টানিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "চলুন, শয়ন করা যাক্, রাত্রি অনেক হইয়াছে।" বন্ধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং লুক্কায়িত খাদ্য বাহির করিয়া দিলেন। তখন তিনি কিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিতে গেলেন। শত শত ব্যক্তির আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ হলে বসিয়া যিনি এরূপ চিন্তামগ্ন হইতে পারেন যে আহারের কথা মনে থাকে না, তাঁহার একাগ্রতা সামান্য নহে।

প্রকৃত সত্যান্বেষীর আর একটি লক্ষণ,—নির্ভিকতা বা সাহস। প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার অনেক সময় সমাজের এতই প্রীতিপ্রদ, এতই মনোরম, এতই অস্থিমজ্জাগত যে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর সত্যটীকে বাহির করা ও ঘোষণা করা, কম সাহসের কর্ম্ম নহে। অনেকে সত্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি সত্য ত্যাগ করেন নাই। গ্রীক দেশীয় সক্রেটিসের বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এতদ্ব্যতীত ইউরোপে যে কত বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্য নিদারুণ অত্যাচার, অপমান ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। খৃষ্টানদিগের ইহাই বিশ্বাস যে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম কয়েক হাজার বৎসরমাত্র। সুতরাং যে ভূ-তত্ত্ববিদ্ (Geologist) এই প্রচলিত কুসংস্কারটির মধ্যে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মনের বল ও সাহস কি অসাধারণ, ভাবিয়া দেখুন। প্রত্যেক জীবজন্তুকে ঈশ্বর পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই খৃষ্টানদিগের দীর্ঘকাল-সঞ্চিত ও সযত্ন-পোষিত প্রিয় বিশ্বাস। ডারউইন্ যদি নির্ভিকচেতা, সত্যানুসন্ধিৎসু না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি নিজের প্রিয়তম ভ্রান্ত সংস্কারটীকে চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া কঠোরভাবে সত্যের আবিষ্কার ও ঘোষণা করিতে পারিতেন? যাগ, যজ্ঞ, পশুবলি ও আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডই একমাত্র ধর্ম্ম,—ইহা যে হিন্দু সমাজের বিশ্বাস ছিল, সেই হিন্দু সমাজেই জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহাপুরুষ 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এবং

জ্ঞানই মুক্তির হেতু,' এই মহাসত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিতে পারেন, তাঁহার সাহস কি অসামান্য নহে? অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রিয়তম সংস্কারগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, সেগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত অনুসন্ধান করিতে সাহস করেন না। পাছে তাঁহাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়েই তাঁহারা ভীত। কিন্তু জ্ঞান-মার্গীর সে ভয় নাই। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয়।

জ্ঞান-মার্গীর আর একটী প্রধান লক্ষণ,—সর্ব্বত্র অনুসন্ধান। তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ, ছোট বড় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর নহে, কারণ সত্য সকল বস্তুর মধ্যে থাকিতে পারে, রহস্য সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন আছে। সুতরাং একটি সৌরজগৎ তাঁহার যেরূপ মনোযোগের সামগ্রী, একটি ক্ষুদ্র জলবিন্দুও তদ্রূপ। হয়ত একটি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক কীটের গঠন-প্রণালী হইতে এরূপ রহস্য পাওয়া যাইতে পারে, যাহা প্রকাণ্ড গ্রহাদির পর্য্যবেক্ষণেও পাওয়া যায় না। প্রকৃতির রাজ্যে ছোট বড় সমস্তই একই নিয়মে বাঁধা; সুতরাং একটি খনিজ পদার্থের পরমাণু সমাবেশ বুঝিলে হয়ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-রহস্য বুঝা যাইতে পারে। এই জন্য তিনি কোন বস্তু উপেক্ষা করেন না, অগ্রাহ্য করেন না। রুষ দেশীয় এক প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক একটি সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে

তিনি পর্ব্বত মধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরটি পর্ব্বত হইতে খোদিত এবং এরূপ বৃহৎ যে একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি দেখিলেন, তন্মধ্যে এক বিশালকায়া অমিততেজাঃ দেবী একাকিনী বসিয়া নিবিষ্টমনে একটি কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছেন। জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক ও প্রেমের বিমল জ্যোতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেবীর ঐকান্তিক যত্ন ও একাগ্রতা দেখিয়া কবি ভাবিলেন, "নিশ্চয়ই ইনি কোন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের মস্তিষ্ক নির্ম্মাণ করিতেছেন।" যাহা হউক, তিনি ভক্তিভাবে দেবীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কি কার্য্যে নিমগ্না?" দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "আপাততঃ আমি একটি মক্ষিকার পশ্চাতের একখানি পা নির্ম্মাণ করিতেছি।" বাস্তবিক, প্রকৃতি দেবী এই রূপই বটেন, তিনি সকল জিনিষই নিখুঁত করিয়া গড়েন, তাঁহার কাছে উচ্চ, নীচ, ক্ষুদ্র, মহৎ নাই।

এইরূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে করিতে সত্যের পর সত্য আবিষ্কার করিতে করিতে, জ্ঞান-মার্গী অগ্রসর হইতে থাকেন। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, কোন বস্তুই, তিনি ত্যাগ করেন না। অনুবীক্ষণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে, দূরবীক্ষণ দূরস্থ ও বৃহৎ পদার্থের তত্ত্ব আনিয়া দেয়। এইরূপে তিনি স্থূল জগতের সকল সত্যই অধিকার করেন, পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্বই তাঁহার

করায়ত্ত হয়। তখন সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ উপ-গ্রহাদির রহস্য ভেদ করিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদম্য উৎসাহে, তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হয়, তিনি ভুবর্লোক দেখিতে পান, তথায় গমনাগমন করিতে সমর্থ হন। তখন অসংখ্য নূতন বস্তু তাঁহার নয়নগোচর হয়; তিনি আবার পর্যাবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের তথ্য অবগত হন; ক্রমে ক্রমে ভুবর্লোক করায়ত্ত করেন। এইরূপে মনে করা যাক, তিনি একে একে স্বর্লোক, মহর্লোকাদি চতুর্দ্দশ ভুবনই করায়ত্ত করিলেন, গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেরই জ্ঞান লাভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আর একটি বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। ধরিলাম ইহাও তিনি করায়ত্ত করিলেন; এবং এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড, সৌর-জগতের পর সৌরজগৎ, অধিকার করিয়া জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, সমুদ্র-তটে বালুকা-কণারও সংখ্যা হয়, ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।২ পাশ্চাত্য জগতের দূরবীক্ষণ তার সাক্ষ্য দিতেছে। নক্ষত্রের পর নক্ষত্রপুঞ্জ! তারপর দূরতর নক্ষত্রপুঞ্জ! সীমা নাই, অন্ত নাই!! তিনি যতই অধীকার করিতে থাকেন, ততই নূতন অজ্ঞাত জগৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি কত জানিবেন? অনন্ত, অসীমকে কি জানিয়া কখনও শেষ করা যায়? কাজেই কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি হতাশ, ভগ্নোদ্যম, ক্লান্ত হইয়া

পড়েন। বুঝিতে পারেন এ পথে জ্ঞানের সীমা পাওয়া যাইবে না, চরম সত্য মিলিবে না।

তখন, এইরূপ চিন্তা ও বিচার তাঁহার মনে উদিত হয়। "এতকাল পর্য্যন্ত যাহা দেখিলাম, জগতের পর জগৎ, লোকের পর লোক, সমস্তই তো পরিবর্ত্তনশীল! সকল পদার্থেরই বিকার আছে, জন্ম, জরা, মৃত্যু আছে। বৃক্ষ-লতা, কীট-পতঙ্গ, গিরি-নদী, স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় বস্তুরই তিল তিল করিয়া নাশ হইতেছে, -অবস্থান্তর হইতেছে। তড়িৎ, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ, পরমাণু, যাহা-দিগকে স্থূল জগতে চরম সত্য ভাবি, সূক্ষ্মজগতে গিয়া দেখি, তাহাদের আর সে রূপ নাই, অবস্থান্তর হইয়াছে। এই পৃথিবী যাহাকে নিত্য ভাবিতেছি, তাহারও স্থিরতা নাই, কালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রকাণ্ড সৌর-জগৎ চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, অনন্ত শূন্যে মিশিয়া যাইতেছে! আবার নূতন সৌরজগতের আবির্ভাব হইতেছে। এইরূপে যতদূরই যাই না কেন, নক্ষত্র হইতে নক্ষত্র, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম,— পরিবর্ত্তন, বিকার, ধ্বংস, সৃষ্টি! আবার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির নিয়ত কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে! এক কালে বালক ছিলাম, পরে যুবক হইলাম, ক্রমে বৃদ্ধ হইতেছি। এককালে একটি ইন্দ্রিয় ছিল, পরে পাঁচটি হইল, আরও কত হইবে কে জানে? স্থূল ব্যক্তি কৃশ হইতেছে, শ্যামবর্ণ গৌরবর্ণ হইতেছে, নির্দ্দয় দয়ালু হই-তেছে, চোর সাধু হইতেছে, মূর্খ জ্ঞানী হইতেছে, যিনি

পূর্ব্বে ভূলোক মাত্র দেখিতে পাইতেন, তিনি আজ ভুব-র্লোক, স্বর্লোকও দেখিতেছেন। অতএব দেহ, মন, বুদ্ধি স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই বিকারশীল, অনিত্য। হায়! তবে সত্য কোথায়? আমি যে চরম সত্যটি খুঁজিতেছি, যাহা অনন্তকালেই একভাবে থাকে, যাহার বিকার নাই, ধ্বংস নাই, জন্ম নাই, জরা নাই, সেটি কোথায়?" এই রূপ যখন জ্ঞান-মার্গী চরম সত্যের জন্য আকুল হন, তখন কে যেন তাঁহার অন্তর হইতে বলিয়া দেন "সত্য বাহিরে নাই, ভিতরে অনুসন্ধান কর।"

এই দৈববাণীতে আশ্বস্ত হইয়া তিনি পুনরায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবেন "যাহা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম সবই অনিত্য বটে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছুই কি নিত্য নাই? জগতের পর জগৎ, ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড, কত বস্তুই দেখিলাম! এই অসংখ্য বস্তুর পরিবর্ত্তন আছে বটে, কিন্তু দেখিতেছে কে? তাহার কি কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার ঘটিয়াছে? এই যে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, ইনি কি চিরকালই একভাবে নাই? আমি যুবক ছিলাম বৃদ্ধ হইলাম, চক্ষুষ্মান্ ছিলাম অন্ধ হইলাম, মূর্খ ছিলাম জ্ঞানী হইলাম বা নাস্তিক ছিলাম ভক্ত হইলাম। এই যে বিকার বা পরিবর্ত্তনগুলি ঘটিল, ইহা তো দেহের ও মনেরই পরিবর্ত্তন। আমার (চৈতন্যের) কোন বিকার ঘটিয়াছে কি? যে চৈতন্য পূর্ব্বে অল্প দেখিতে ছিল, জানিতেছিল, সে এখন অধিক দেখিতেছে, অধিক জানিতেছে। জ্ঞানের ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন

হইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, পরেও ঠিক তিনিই আছেন।৩ অতএব যদি কিছু নিত্য বস্তু থাকে, যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা এই জ্ঞাতা, এই চৈতন্য। বাস্তবিক, এই চৈতন্য ব্যতীত অন্য যাহা কিছু আছে তাহার প্রমাণ নাই। আমার সম্মুখে একটি গোলাপ ফুল রহিয়াছে। আমি উহা দেখিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, কোমলতা অনুভব করিতেছি, সুতরাং বলিতেছি উহা একটি বাস্তব পদার্থ (a real thing); কিন্তু স্বপ্নেও তো গোলাপ ফুল দর্শন, ঘ্রাণ ও স্পর্শ করা যায়। তখন তো প্রকৃত বস্তুটি সম্মুখে থাকে না, অথচ অনুভূতি হয়। আবার তন্দ্রাবিষ্ট (hypnotised) ব্যক্তির হাতে একটি গোলাপ ফুল দিয়া যদি বলা হয় "ইহা একটি টাকা, বা সাপ, বা হাতী" তাঁহার ঠিক তত্তৎ অনুভূতিই হয়। পুনশ্চ, কিছুই না দিয়া যদি বলা হয় 'তোমাকে একটি গোলাপ ফুল দিলাম', তিনি গোলাপ ফুলই দেখিতে থাকেন। অতএব, গোলাপ ফুলের অস্তিত্বের উপর উহার জ্ঞান বা অনুভূতি নির্ভর করিতেছে না। গোলাপ ফুল না থাকিলেও উহার অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে। আবার দেখা যায় ভূলোকবাসীর যেরূপ অনুভূতি হয়, ভুবর্লোকবাসী বা স্বর্গবাসীর সেরূপ অনুভূতি হয় না। একই পদার্থকে তাঁহারা বিভিন্ন প্রকারে অনুভব করেন। উপাধির বা দেহের তারতম্য হেতুই অনুভূতির তারতম্য হয়। চৈতন্য স্থূলোপাধিদ্বারা এক প্রকার অনুভব করেন, সূক্ষ্মোপাধিদ্বারা অন্য

প্রকার অনুভব করেন। অতএব চৈতন্যের বিভিন্ন উপাধি বা বিভিন্ন অবস্থা নিবন্ধনই, বিভিন্ন অনুভূতি হয়। একই অনন্ত অখণ্ড চৈতন্য নানা মূর্ত্তিতে নানা ভাবে, নানা প্রকার অনুভব করিতেছেন। এই অনন্ত অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র সত্য, আর ইহাঁর অসংখ্য অবস্থা, ভাব বা অনুভূতি মিথ্যা, অনিত্য, জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এই চৈতন্যই আত্মা বা ব্রহ্ম বা ভগবান বা God। একমাত্র ইঁনিই আছেন। ইনিই সব। বিশেষ বিশেষ জীব ইহাঁরই বিশেষ বিশেষ ভাব (mode of consciousness) মাত্র। পশু একটি ভাব, মানব একটি ভাব, ইন্দ্র আর এক ভাব মনু অন্য এক ভাব, ইত্যাদি।[8] কিন্তু এই অসংখ্য ভাবের কোনটিই জীবের স্ব-ভাব নহে। একমাত্র তিনিই, সেই অখণ্ড চৈতন্যই, সর্ব্বজীবের স্ব-ভাব বা স্বরূপাবস্থা। "জীবের উন্নতি" শব্দের অর্থ কি? চৈতন্যের একটি ভাব হইতে উচ্চতর ভাবে উপনীত হওয়া। এরূপ উঠিতে উঠিতে সকল জীবই এককালে স্ব-ভাব বা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। শাস্ত্রে ইহারই নাম লয়, কৈবল্য অপবর্গ, মোক্ষ, আত্মসাক্ষাৎকার, ভগবদ্দর্শন, নির্ব্বাণ, সমাধি। ইহাই "সত্যস্য সত্যং," জ্ঞানের পরিসমাপ্তি।

পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া জ্ঞান-মার্গী বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্ম বা চৈতন্যই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং তদ্ব্যতীত যাহা কিছু, সমস্তই অনিত্য, অসার। ইহারই নাম বিবেক বা নিত্যানিত্য বোধ। ইহার অবশ্যম্ভাবী

ফল—বৈরাগ্য। যেমন সমস্ত পদার্থ অসার, তুচ্ছ, অলীক বলিয়া মনে হয়, অমনি তত্ত্বাবতের প্রতি একটা তীব্র বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ঘৃণার উদ্রেক হয়। "আমি স্বরূপতঃ কি বস্তু! আর কি অবস্থায় রহিয়াছি!! ছি! ছি! এই মিথ্যা কাল্পনিক সংসারটাকে সত্য ভাবিয়া মুগ্ধ রহিয়াছি? না, কখনই তাহা হইবে না।" এই ভাবিয়া তিনি সংসার, সমাজ, গৃহ ছাড়িয়া বিরলে থাকেন। কিন্তু দেখেন মনটা বড়ই চঞ্চল, চপল শিশুর ন্যায় কেবল ছুটাছুটি করে। বহুজন্মার্জ্জিত অভ্যাস বশতঃ, সে বিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয়, অলীক সংসারের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, আত্ম-সাক্ষাৎকার পাইবার অধিকারী হইতে হইলে, অগ্রে কয়েকটি শক্তি অর্জ্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রথমে তিনি শম-গুণের সাধনা করেন। চিত্তের স্থিরতাই শম। যতই বিপদ-আপদ, পুত্রনাশ, অর্থনাশ, দৈহিক পীড়া, অপমান, নির্য্যাতন হউক,—মনকে স্থির, প্রশান্ত, অটল রাখিতে হইবে, মনে ভয় নাই, বিষাদ নাই, ক্রোধ নাই, অসন্তোষ নাই। মন কাঁপিবে না, টলিবে না; যে চিন্তাতে ইহাকে ধরিয়া রাখা হইবে, উহা ঠিক তাহাতেই স্থির হইয়া থাকিবে। তার পর দম, অর্থাৎ দেহের সংযম। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহারা আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা দেহীর অনুগত থাকিবে। দেহী যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবেন, ইহারা কেবল তাহাই পালন করিবে। অতঃপর উপরতি

অর্থাৎ সকলের সহিত সহৃদয়তা। রীতি নীতিতে, আচার ব্যবহারে বা ধর্ম্মমতে, অপরের সহিত অনৈক্য হইলেও তাহাদিগকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করিয়া, তাহারা যে একই আত্মার বিভিন্ন বিকাশ বা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপান, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। তারপর, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। সহিষ্ণুতা বা সর্ব্বাবস্থায় চিত্তের প্রফুল্লতার নামই তিতিক্ষা। যাহাই ঘটুক না কেন, প্রফুল্ল থাকিতে হইবে, সদানন্দ থাকিবে। ভাবিতে হইবে, "আমার কর্ম্মক্ষয় হইতেছে, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবের ও জগতের কল্যাণ করিতে পারিব।" নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর, এবং গুরুর উপর অটল বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। তন্ময়তা বা মন-প্রাণ সমর্পণের নাম সমাধান। যে কার্য্য ধরিবে, মন-প্রাণ ঢালিয়া দিবে; সর্ব্বান্তকরণে করিবে; প্রলোভনে, বিপদে, ভয়ে, কিছুতেই ছাড়িবে না।

পূর্ব্বোক্ত ছয়টি গুণ সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক পরিমাণে অধিকৃত হইলে, জ্ঞানমার্গী প্রকৃত জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকারী হন। এই সময় তাঁহার গুরুদর্শন হয়। তাঁহাকে যোগ্য পাত্র দেখিয়া, সদ্‌গুরু আবির্ভূত হন এবং কৃপা পূর্ব্বক একবার সত্যের মূর্ত্তিটি দেখাইয়া দেন। এক মুহূর্ত্ততরেও স্ব-রূপটি দেখিতে পাইয়া, সাধক ইহার সৌন্দর্য্যে এতই বিমোহিত ও আকৃষ্ট হন যে, ইহাঁকে পাইবার জন্য তাঁহার বলবতী পিপাসা জাগিয়া উঠে। ইহারই নাম মুমুক্ষা বা মুক্ত হইবার ইচ্ছা।

এই "মুমুক্ষা" শব্দটির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, অনেকে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া এক অপার্থিব, অলৌকিক রাজ্যে চিরকাল বিমল আনন্দ ভোগ করার নামই মুক্তি, ইহা অনেকের ধারণা। সুতরাং তাঁহারা ভাবেন এই আনন্দ ভোগ করিবার ইচ্ছাই মুমুক্ষা। মুমুক্ষা আনন্দ পাইবার ইচ্ছা নহে, আনন্দ দিবার ইচ্ছা; জগৎ হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছা নহে, জগতের সর্ব্বত্র আপনাকে প্রসারিত, ব্যাপ্ত করিবার ইচ্ছা,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে "আমি" বা "আমার" জ্ঞান করিবার ইচ্ছা। যাঁহারা ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য মোক্ষ সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা জন্মমৃত্যু শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল জনলোকে বাস করতঃ, অপার্থিব আনন্দ ভোগ করেন সত্য; কিন্তু কল্পের পর তাঁহাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। পরন্তু যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ধ্বংস করিয়া পরার্থে আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত, তাঁহারাই কেবল স্বরূপ জানিতে পারেন, প্রকৃত মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

সে যাহা হউক, জ্ঞান-মার্গী মুমুক্ষু গুরূপদেশানুসারে পুনরায় বিচারে প্রবৃত্ত হন, আত্ম-ধ্যানে নিরত হন। তিনি ভাবেন, "অহো! আমি কি ভ্রান্ত! আমি যে কি বস্তু তাহা ভুলিয়া গিয়া, আপনাকে এক-দেহধারী মানব মনে করিতেছি! যেমন এক রাজ-কুমার সুবর্ণময় প্রাসাদে কোমল পুষ্পশয্যায় নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রচণ্ড দাবানলে দগ্ধ হইতেছেন

এবং এই স্বপ্ন দেখিয়াই কল্পিত জ্বালা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ এই অলীক সংসারের কল্পিত দুঃখ-ক্লেশে কাতর হইতেছি! যেমন চিরপ্রশান্ত, নীল নভোমণ্ডলের উপর মেঘ উঠে, বিদ্যুৎ খেলে, ঝড় বৃষ্টি হয়, কিন্তু মেঘের পরপারে সেই স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ চিরকালই অবিকৃত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই জগৎটা আবির্ভূত হইয়াছে, ইহার পরপারে চিরকাল আমি স্বরূপে অবস্থান করিতেছি, স্থির প্রশান্ত, নিত্যানন্দ রহিয়াছি। আমি স্থির সমুদ্র স্বরূপ; আমাতেই বীচি, তরঙ্গ, ফেণ, বুদ্বুদ উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। আমাতেই পৃথক পৃথক জীব, পৃথক পৃথক ভূত, পৃথক পৃথক জগৎ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। যতক্ষণ ইহাদের স্বতন্ত্র নাম রূপ থাকে, ততক্ষণই ইহারা স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমিই সব, ইহারা আমারই বিশেষ বিশেষ ভাব, বিশেষ বিশেষ অবস্থা। যেমন একই শুভ্র সূর্য্যালোক বিভিন্ন কাচের মধ্য দিয়া বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, যেমন একই তড়িৎ বিভিন্ন উপাধি হেতু কখনও উত্তাপ, কখনও আলোক, কখনও শব্দ এবং আনবিক আকর্ষণরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই অখণ্ড চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন জীব-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমি সেই অখণ্ড চৈতন্য। যেমন শব্দ, আলোক বা উত্তাপ তড়িতের স্বরূপ নহে, তড়িৎই তড়িতের স্বরূপ, সেইরূপ কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, নর-বানর, যক্ষ-রক্ষ, সুর-অসুর, ঋষি-মনু, ব্রহ্মা-প্রজা-

পতি, কোনটিই আমার স্বরূপ নহে, ব্রহ্মই আমার স্বরূপ। আমি ব্রহ্ম,—অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই। আমার পুত্র-কলত্র নাই; শত্রু-মিত্র নাই, গুরু-শিষ্য নাই, পিতা-মাতা নাই। আমাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। যেমন বায়ু মহান্ ও সর্ব্বগামী হইলেও আকাশের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ এই জগৎ বিশাল, প্রকাণ্ড হইলেও আমারই একাংশে অবস্থিত। অথচ আমি আমাকে ক্ষুদ্র মানব ভাবিয়া, ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট, ক্ষুন্ন, পুষ্ট, সুখী, দুঃখী, জাত, মৃত হইতেছি। হায়! এ স্বপ্নের অবসান কি হইবে না? আর আমি স্বপ্ন দেখিতে চাহি না। হে আত্মন্! হে ব্রহ্মণ্! কৃপা করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ! তুমি যে পরম সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যের একবিন্দু পাইয়াই জগৎ এত সুন্দর। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তই তোমার কণামাত্র, কটাক্ষমাত্র, ক্ষুদ্র বিকাশমাত্র। হে সুন্দরতম! আর কতকাল লুকাইয়া থাকিবে? প্রাণেশ্বর! এস, দেখা দাও। আঁধার ঘর আলোকিত কর। লৌহ, স্বর্ণ হউক, জীবন সার্থক হউক, যেন জগৎকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি; সর্ব্বভূতকে, সর্ব্বজীবকে, আত্মার মধ্যেই অবস্থিত দেখিতে পাই!"

সাধক যখন এইরূপে আত্মান্বেষণে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার অবস্থাটি কিরূপ হয়, ভগবান্ অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১
গীতা—ত্রয়োদশ অঃ।

অর্থাৎ, 'তাঁহার আত্মশ্লাঘা নাই, দম্ভ নাই, হিংসা নাই। সকলের প্রতি ক্ষমা, বালকের ন্যায় সরলতা, গুরুসেবা, বাহিরের ও ভিতরের পবিত্রতা, স্থিরতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তাঁহাতে বিরাজমান। ভোগ্যবস্তুর প্রতি স্পৃহা নাই, অহঙ্কারের লেশ নাই। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নিবন্ধন জীব নিয়ত যে দুঃখ ও অনিষ্ট ভোগ করে, তিনি তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেন। কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, পুত্র কলত্র এবং গৃহাদিতে অনুরক্ত নন, ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক তুল্য

জ্ঞান করেন, আমার (আত্মার) প্রতি স্থির ও প্রগাঢ় ভক্তি করেন, সর্ব্বদা নির্জ্জনে বাস করেন, জনসমাজে মিশিতে চান না। সর্ব্বদাই আত্মচিন্তা-পরায়ণ থাকেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লভ্য মোক্ষই যে একমাত্র সার বস্তু, ইহাই সর্ব্বদা অনুভব করেন। ইহাই জ্ঞানীর লক্ষণ। ইহার বিপরীতই অজ্ঞান।"

পূর্ব্বোক্তরূপে আত্ম-ধ্যান করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকেন, চৈতন্যের উচ্চ হইতে উচ্চ-তর স্তরে উপনীত হইতে থাকেন। কিন্তু আত্মাই তাঁহার লক্ষ্য, আত্ম-দর্শন ব্যতীত তিনি অপর কিছুই চান না। সুতরাং যত উচ্চ অবস্থাই তিনি প্রাপ্ত হউন না কেন, তিনি বলেন, "নেতি, নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়, ইহা আমি চাহি না, ইহা ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মায়া। এইরূপে যাবতীয় ভাব, যাবতীয় অবস্থা প্রত্যাখ্যান করিয়া অবশেষে তিনি আত্মলাভ করেন, স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন, তিনি প্রকৃত যাহা তাহাই হইয়া যান। তিনি এখন জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। তিনি আর মানুষ নাই, মানুষের শরীর ধারণ করিলেও, মানুষের ন্যায় হস্ত পদ থাকিলেও, তিনি আর মানুষ নহেন। তবে তিনি কি? তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? ইহা বর্ণনা বা ধারণা করা অসম্ভব। তবে গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রথমেই আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুক্ত হইলেই পৃথিবী ছাড়িয়া যে একটি উচ্চতর স্থানে যাইতে হইবে, অথবা

দেহ থাকিবেনা, অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে,—ইহা না হইতেও পারে। স্থান পরিবর্ত্তনে বা দেহ পরিবর্ত্তনে মুক্তি হয় না, চৈতন্যের পরিবর্ত্তনেই মুক্তি। সুতরাং যে স্থানে হউক বাস করিয়া, যে দেহই হউক ধারণ করিয়া, জীব মুক্ত হইতে পারেন। বাস্তবিক, দেশকাল একটা ভ্রান্তি বা কল্পনা মাত্র। আত্মা বা চৈতন্যের নিকট দেশ কাল নাই। তিনি চিরকালই এক স্থানে আছেন বা সর্ব্বস্থানেই আছেন, কারণ তাঁহার নিকট স্থান নাই।

ভগবান গীতায় বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ১০-২০।

'হে গুড়াকেশ! আমি আত্মা। সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছি!'

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬-২৯।

'যিনি যোগযুক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শন, তিনি আত্মাকে (আপনাকে) সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সর্ব্বভূতকে আত্মার (আপনার) মধ্যে অবস্থিত দেখেন।'

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ৭-৭।

'সূত্রে যেরূপ মণি গাঁথা থাকে, সেইরূপ আমাতেই সব গাঁথা রহিয়াছে'—

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থোমমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৯-৫।

'আমি সর্ব্বভূতকে ধারণ ও পালন করিতেছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে লিপ্তভাবে অবস্থিত নহি।' অতএব,

দেখা যাইতেছে, আত্মা সর্ব্বভূতকে ধারণ করিয়া আছেন, সর্ব্বভূত আত্মাতেই অবস্থান করিতেছে। জীবন্মুক্ত পুরুষের ইহাই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। তাঁহার আমিত্ব দেহের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ব্রহ্মাণ্ডময় প্রসারিত হয়। আমাদের নিকট দেহটি বা পরিবারটিই "আমি"; ইহাদের সুখ দুঃখেই আমাদের সুখ দুঃখ; কিন্তু জীবন্মুক্তের নিকট সমগ্র বিশ্বই "আমি"; সুতরাং তিনি যেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সর্ব্বজীব, সর্ব্বভূতই তাঁহার অংশ বা অঙ্গ, কেহই তাঁহা হইতে পৃথক বা বিচ্যুত নহে। তিনি অনুভব করেন, তিনিই অসংখ্য ভাবে অবস্থান করিতেছেন; "পশু আমি, মানব আমি, দেবতা আমি, যক্ষ আমি, গন্ধর্ব্ব আমি, কিন্নর আমি, সবই আমি, আমারই বিশেষ বিশেষ ভাব"।৬ অবশ্য পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, সর্ব্বজীবই আমি,—সর্ব্বজীব আমা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা এবং সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত অবস্থাটি শেষোক্ত অবস্থার অনেক উচ্চে, কারণ শেষোক্ত অবস্থায় ভেদজ্ঞান আছে, প্রথমোক্ত অবস্থায় উহা তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং জীবন্মুক্তের নিকট দ্বিতীয় বস্তুই নাই, সবই আমি,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ৯-১৬।

'আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম। আমিই

সব।' অতএব, জগৎকে ভালবাসা বা জীবকে ভালবাসা তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা। "জগৎ কি আছে? জীব কি আছে? সবই তো আমি। আমি আমাকেই ভালবাসি ;"—

* * * * ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়া ভবন্তি * * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

বৃহদারণ্যক—৪-৫-৬।

"আমি কি পুত্রকে ভালবাসি? না, না। আমাকেই ভালবাসি। পুত্র কই? সে ত আমি। আমি কি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সবই ভালবাসি? না, না। আমি আমাকেই ভালবাসি। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ত নাই, সবই যে আমি।" ইহারই নাম মোক্ষ, আত্মদর্শন, নির্ব্বাণ, ভগবৎপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জীবন্মুক্ত পুরুষ আমাদের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ বা কর্ম্ম করেন কি? প্রয়োজন হইলেই করেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম ও আমাদের কর্ম্মে প্রভেদ আছে। বাস্তবিক কর্ম্ম করে কে? প্রকৃতিই কর্ম্ম করে। প্রকৃতি কি? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি। আত্মা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা। তিনি কেবল দেখেন, আর যত কিছু কর্ম্ম প্রকৃতিই করেন,—বুদ্ধি নিশ্চয় করে, মন সঙ্কল্প বিকল্প

করে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় ভোগ করে। কিন্তু আমরা ভাবি, "আমিই মন, আমিই বুদ্ধি বা আমিই দেহ।" প্রকৃত আমি বা আত্মা যে এগুলি হইতে স্বতন্ত্র, সে জ্ঞান আমাদের নাই। সুতরাং আমরা যাহা করি, তাহা আমাদেরই কর্ম্ম; কিন্তু জীবন্মুক্ত বা আত্মজ্ঞানী যাহা করেন, তাহা তাঁহার কর্ম্ম নহে; প্রকৃতিরই কর্ম্ম। তিনি বেশ দেখিতে পান, তিনি নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছেন। ভগবান ইহা স্পষ্টাক্ষরে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ১৩-২৯।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৫-৮।

অর্থাৎ 'প্রকৃতি দ্বারাই সব কর্ম্ম করা হইতেছে, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কিছু করেন না; যিনি ইহা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন এবং তদ্দ্বারা পরমা গতি প্রাপ্ত হন; অন্যে প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস—যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও "আমি কিছুই করি না" এইরূপ জ্ঞান করেন।' গোপালতাপনী উপনিষদে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একদা দুর্ব্বাসা মুনি অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া যমুনার পরপারে বাস করিতেছিলেন। বৎসরান্তে তিনি একদিন আহার করিতেন। তাঁহার ভোজনের দিন উপস্থিত হইলে

শ্রীকৃষ্ণ বহুসংখ্যক গোপীর হস্তে নানাবিধ ও প্রচুর খাদ্য দিয়া মুনিকে দিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। গোপীরা বলিলেন, "নদী পার হইব কিরূপে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নদীর নিকটে গিয়া বল, 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, একথা যদি সত্য হয়, হে যমুনে আমাদিগকে পথ দাও'।" গোপীরা পরস্পরের গা টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, কারণ, কৃষ্ণ কিরূপ ব্রহ্মচারী, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। যাহা হউক, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা তাহাই করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যমুনা দু'ফাঁক হইলেন! সুন্দর পথ হইল, তাঁহারা পারে আসিলেন। দুর্ব্বাসার নিকট সেই রাশী· কৃত ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইল, মুনি একে একে সেই শত শত পাত্র উদরসাৎ করিয়া গোপীদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু গোপীদের পুনরায় নদী পার হইতে হইবে। তাঁহারা বলিলেন, "মুনে, কিরূপে নদী পার হই?" মুনি বলিলেন, "নদীকে বল 'দুর্ব্বাসা বায়ুভুক্ (অনশনী), ইহা যদি সত্য হয়, হে যমুনে. আমাদিগকে পথ দাও'।" ইহা শুনিয়া গোপীগণ ত' অবাক্! শত শত পাত্র উদরস্থ করিয়াও বায়ুভুক্! যাহা হউক, তাঁহারা নদীর নিকট গিয়া তাহাই বলিলেন। নদী পুনরায় পথ করিয়া দিলেন, তাঁহারা পার হইলেন। তাঁহারা দুর্ব্বাসার নিকট ইহার রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। মহর্ষি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ গীতা ৪-৩৭

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তোনিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ঐ,৪-২

"যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। যিনি সদাই আত্মানন্দে বিভোর, যাঁহার আদৌ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই এবং যিনি কিছুরই মুখাপেক্ষী বা প্রত্যাশী নন, তিনি যাবতীয় কর্ম্ম করিলেও কিছুই করেন না।" সুতরাং দুর্ব্বাসা খাইলেও অনাহারী। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত বিহার করিলেও ব্রহ্মচারী! ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মরহস্য! জীবন্মুক্ত পুরুষের যাবতীয় কর্ম্মই এইরূপ।

কিন্তু এখানে একটি ভ্রান্তির সম্ভাবনা, পতনের আশঙ্কা আছে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যতদিন জীবের বিশিষ্ট ভেদাত্মক 'আমি'টি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন "সোঽহং"—আমিই সেই, "অহঞ্চ ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম,—ইহা বলিবার তাঁহার অধিকার নাই। কারণ, ইহা তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কথা। বিশিষ্ট আমিটি আত্মা নহে, প্রকৃতির বিকার মাত্র। যাঁহার প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে নাই, যিনি প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক কর্ম্ম করেন, এরূপ ব্যক্তিও মাঝে মাঝে "আমি ব্রহ্ম, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করিতেছে" ইত্যাদি মুখে বলিয়া থাকেন। হয়ত লোভবশতঃ নানাবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য-দ্রব্য আহার করিয়া বলিলেন "ভোজনেচ্ছা দেহেরই ধর্ম্ম, দেহ ভোজন করিয়াছে,—'গুণাঃ গুণেষু

বর্ত্তন্তে', আমার (আত্মার) ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, আমি ভোজন করি নাই।" এরূপ ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত বা আত্ম-প্রতারিত। প্রকৃত আত্মজ্ঞানী প্রকৃতি-তাড়িত হন না; প্রকৃতিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করেন, সুতরাং দৈহিক মানসিক যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহার ইচ্ছাধীন। ইহা না বুঝিয়া অথবা আত্ম-প্রতারিত হইয়া মুখে 'সোহহং' বলিয়া ভারতবর্ষে অনেকে বেদান্তের অবমাননা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই হতভাগ্যগণ তাঁহাদেব নিজ উন্নতির পথে নিজে কণ্টক দিতেছেন। অতএব, জ্ঞানমার্গীদিগের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য যেন তাঁহারা ইহাঁদের মত ভ্রমে পতিত না হন।

সাধক শাস্ত্র-বচন।

(১) অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিতেছেন,—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥ ১২—৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥১২—৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥১২—৫

আর যাঁহারা আমার সেই সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির অবিষয়, সুতরাং অনির্দ্দেশ্য এবং অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপক, প্রকৃতি-মধ্যবর্ত্তী অচল ও নিত্যক্ষয়ব্যয়রহিত পরমাত্মাবস্থায় সমাধি করিতে পারেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মাকেই সর্ব্বত্র সমভাবে সন্দর্শন করেন, অথবা সুখদুঃখাদিকে সমভাবে সন্দর্শন করেন, তাঁহারা তো যোগিশ্রেষ্ঠই বটেন, কিন্তু সেই সর্ব্ব-প্রাণিহিতে রত মহাত্মাগণ আমাতে (পরমাত্মাতে) মিলাইয়া গিয়া নির্ব্বাণ পদই প্রাপ্ত হইয়া যান।

কিন্তু যাঁহারা অব্যক্তাসক্তচেতা অর্থাৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব পরমাত্মাতে সমাধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে, কারণ প্রাণিদিগের পক্ষে দেহাভিমান (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রকৃতি প্রভৃতিতে— যে সর্ব্বদা "অহং—আমি" ধারণা আছে, তাহা) পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ পরমাত্মাতেই "অহং-ভাব বা আমিত্ব" জ্ঞান করিয়া পরমাত্মায় মিশিয়া যাওয়া নিতান্ত দুঃখসাধ্য ব্যাপার।

এই পথ যে কঠিন, তাহা উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কঠ, ১—৩—১৪

বিবেকিগণ সেই আত্মজ্ঞানরূপ পথকে দুরতিক্রমণীয়, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

অল্পসংখ্যক লোকই এই পথ অবলম্বন করিবার উপযুক্ত তাহা ভগবৎগীতায় ভগবান স্পষ্টই বলিতেছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭—৩

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কোন ব্যক্তি সিদ্ধি কামনায় যত্ন করিয়া থাকে, তাহারও সহস্র সহস্রের মধ্যে কচিৎ কেহ আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পায়, অতএব আমার তত্ত্বজ্ঞান বড়ই সুদুর্লভ বস্তু।

আবার সেই গীতারই অন্যত্রে আছে,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭—১৯

হে ধনঞ্জয়, অনেক জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়া তবে আমাকে (আত্মাকে) প্রপন্ন হইতে পারে; অতএব যে মহাত্মা "বাসুদেবই (ব্রহ্ম বা আত্মা) সমস্ত পদার্থ, আত্মা ভিন্ন আরকোন বস্তুরই বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই,' এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি অতিশয় দুর্লভ পাত্র।

(২) ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না,—

প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
অস্যাপি তেষাং সঙ্খ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং নহি ক্ষমঃ॥
দেবী-ভাগবত, ৯-৩-৬

সঙ্খ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥ ঐ ৭
প্রতি বিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
* * * ঐ ৮

তাঁহার প্রতি লোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। এমন কি কৃষ্ণও সেই সকল বিশ্বের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। যদি কখনও ধূলির সংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা গণনা সম্ভবপর নহে; সেইরূপ কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু ও কত মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন তাহারও সংখ্যা নাই। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিদ্যমান আছেন।

ত্রিপাদ-বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে আছে,—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি। চতুর্মুখ-পঞ্চমুখ-ষন্মুখ-সপ্তমুখা-ষ্টমুখাদি-সংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধিমুখান্তৈর্নারায়ণাংশৌ রজোগুণপ্রধানৈরেকৈকসৃষ্টিকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈরেকৈকস্থিতি-সংহারকর্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্‌বুদানন্তসংঘবদ্‌ ভ্রমন্তি।

এই ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে, এইরূপ সাবরণ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিতেছে; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, ষড়্‌মুখ, অষ্টমুখাদি সংখ্যা ক্রমে সহস্রমুখ বিশিষ্ট, নারায়ণের অংশ-রূপী রজোগুণপ্রধান এক একটি সৃষ্টিকর্ত্তা, সত্ত্বতমো-গুণপ্রধান এক একটি পালন ও সংহার-কর্ত্তা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও ঐ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত আছেন। যেমন মহাজলৌঘে মৎস্য এবং জলবুদ্‌বুদ্‌ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে না, সেই-রূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মহাশূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে;—

মন্বন্তরাণ্যসঙ্খ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃপুনঃ ॥

মনু, ১—৮০

এইরূপ অসংখ্য মন্বন্তর সংঘটিত হইতেছে, অসংখ্য অসংখ্যবার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে এবং পরমেষ্ঠী পিতামহও যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অনায়াসে এই সকল সম্পাদন করিতেছেন।

(৩) "জ্ঞানের ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন হই-য়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, পরেও তিনি ঠিক আছেন।"

পঞ্চদশী বলিতেছেন,—

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা। ১—৭

অনন্ত মাস, বৎসর, যুগ, এবং কল্প অতীত হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে তাহারা আসিবে। ইহাদিগের, সকলেরই অন্ত হয়, কেবল এক সম্বিতের আবন্ত বা অন্ত নাই।

দেবী ভাগবতেও তাহাই অন্য ভাবে আছে ;—

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ।

সম্বিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥৭-৩২-১৫

যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।

অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সম্বিদ্বপুঃ পুরা ॥ ঐ—১৬

হিমালয়কে ভগবতী বলিতেছেন,—আরও দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে দৃশ্য পদার্থ সমূহেব ব্যভিচার হয়, কিন্তু যে আমি জাগরিত অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেই আমি স্বপ্নাবস্থাতেও অনুভব করিলাম, আবার সেই আমিই সুপ্তোত্থিত হইয়াও "আমি এতক্ষণ সুপ্ত ছিলাম" এইরূপ অনুভব করিলাম ; অতএব সম্বিৎ পদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না। কিন্তু, যদ্যপি সম্বিদেরও ব্যভিচার অনুভবসিদ্ধ বল, তবে সেই ব্যভিচার অনুভব করে কে ? অবশ্যই চৈতন্যময় সাক্ষীই অনুভব করেন ; অতএব সেই চৈতন্যময় সাক্ষী নিত্য হইলেন এবং তিনিই সম্বিদ্-বপুঃ।

(৪) ঐতরেয়ারণ্যকের দ্বিতীয়ারণ্যকে ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম খণ্ডে আছে,—

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো

জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রম্, ইতি।

এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি। এই সকল অগ্ন্যাদি দেবতা, এই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চ মহাভূত, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, মিশ্র, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিসকল, এই স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিবিধ বীজভূত প্রাণিসকল, এই অণ্ডজ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ প্রাণিসকল, এই গো, অশ্ব, হস্তি, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিসকল, এই জঙ্গম পক্ষ্যাদি ও স্থাবর তরুলতাদি প্রাণি সকল, এই সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। ঐ প্রজ্ঞানেত্র কি তাহা পরে উক্ত হইতেছে। তাহাই বা কিরূপ?

"প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, ইতি। ঐ।

প্রজ্ঞাই লোক সকলের সৃষ্টি হেতু, ইহাই প্রতিষ্ঠা, এবং ইহাই লয়স্থান।

"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ইতি।" ঐ

ইনিই ব্রহ্ম।

(৫) কঠোপনিষদে ইহা সুন্দর ভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥ ৫।৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৫।৯

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৫।১০

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ৫।১১

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৫।১২

প্রাণাদি করণবর্গ সুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার হইলে পর এই যে পুরুষ (আত্মা) ইচ্ছামত বা প্রচুর পরিমাণে কাম্য (অভীষ্ট ভোগ্য) বিষয়সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রৎ থাকেন, স্বীয় স্বপ্রকাশ ভাব পরিত্যাগ করেন না; তিনিই শুদ্ধ (প্রকাশময়,) তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী বলিয়া কথিত হন। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত

লোকই তাঁহাতে আশ্রিত ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৫।৮

একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে তদনুরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন দেহরূপ উপাধি অনুসারে সেই সকল উপাধির অনুরূপ হইয়াও বহিঃ অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হইতে পৃথক্—অবিকৃতভাবেই থাকেন। অথচ একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হন ॥ ৫।৯

একই বায়ু যেরূপ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া, প্রকাশ পাইয়াছেন ; তথাপি তিনি স্বরূপতঃ অবিকৃতই আছেন ॥ ৫।১০

যেমন একই সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষু অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ হইয়াও চক্ষুসম্বন্ধী বাহ্যপদার্থগত দোষে লিপ্ত হন না, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও লোকদুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধী হন না ; (কারণ তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা হইয়াও) বাহ্য অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গ ॥ ৫।১১

বশী (সর্ব্ব নিয়ন্তা) ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ যিনি, এক হইয়াও স্বীয় একটি রূপকে (আপনাকে) দেব, তির্য্যক ও মনুষ্যাদিভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন ; নিজ নিজ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে যে সকল

ধীরগণ (বিবেকিগণ) সাক্ষাৎ অনুভব করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অপরের হয় না ॥ ৫।১২

(৬) মুক্তাবস্থায় তিনি আপনার ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ;—বৃহদারণ্যক এ কথা সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মনমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মাহ্যেষাং স ভবত্যথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ। ১—৪—১০

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্তই ব্রহ্মময় ছিল। ব্রহ্ম আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন বলিয়াই সর্ব্বময় হয়েন। দেবতাদিগের মধ্যেও যিনি আপনাকে ঐ ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিও ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বময় হয়েন। ঋষিদিগের, মনুষ্যদিগের মধ্যেও আত্মতত্ত্বজ্ঞের সর্ব্বময়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া নিজের নিখিলবৃত্তির তদধীনত্ববশতঃ তাঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে বামদেব ঋষি—"আমি মনু হইয়াছিলাম," "আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম," এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ

করিয়াছিলেন। অতএব, ইদানীন্তন কালেও, যিনি ব্রহ্মশক্তিরূপী "আমিকে" শক্তিমৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই প্রকার বিদিত হয়েন, তিনি আপনাকে সর্ব্বময় দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে দেবতারাও আর মহাবীর্য্য বলিয়া বিবেচিত হন না, এবং তাঁহারা তাঁহার কোনও বিঘ্ন বা অমঙ্গল সাধনে সামর্থ হয়েন না ; কারণ তিনি সর্ব্বাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া এই সকলের আত্মা হয়েন। যিনি, এই 'আমি", এই "অপর" এই প্রকার ভেদ দৃষ্টিতে দেবতান্তরের উপাসনা করেন, তিনি অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ; অতত্ত্বজ্ঞ, মনুষ্যের যেমন গাবাদি, তদ্রূপ দেবতাদিগের পশুই হয়েন। পশুসকল যেমন কার্য্য-সাধক, অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও দেবতাদিগের তেমনি কার্য্যসাধক।

ভক্তি-মার্গ।

এখন আমরা ভক্তিমার্গসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞানী ও ভক্তের চরমগতি এক হইলেও, আপাততঃ ইহাঁদের লক্ষ্যের কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ইহা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ কখন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, কখন ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কখন "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি," আবার কখন "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদি আপাত-বিরোধী বাক্য বলায়, অর্জ্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১২।১

অর্থাৎ, "যিনি তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমারই উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী ; অথবা যিনি অক্ষর, অব্যক্ত, নির্গুণের উপাসনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ?" ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২।২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥ ১২।৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১২।৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২।৫

অর্থাৎ যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নিবিষ্ট মনে ও পরম ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। পরন্তু যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে রত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, অচল, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত-গতি লাভ করা দেহ-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অতীব কঠিন, অতএব যাহারা অব্যক্তে আসক্তমনা হয় তাহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়।

ভগবানের এই উক্তি হইতে আমরা তিনটি বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। ১ম, ভক্তি-মার্গী চরমে যে গতি প্রাপ্ত হন, জ্ঞান মার্গীও চরমে সেই গতিই লাভ করেন। ২য়, জ্ঞান-মার্গীর উপাস্য নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম, ভক্তি-মার্গীর উপাস্য সগুণ সোপাধিক ভগবান্। ৩য়, জ্ঞান-মার্গ ক্লেশকর, সাধারণের উপযোগী নহে, ভক্তি-মার্গ অপেক্ষাকৃত সুগম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি জ্ঞান মার্গীর লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় কেবল এক অনন্ত অখণ্ড চৈতন্যের সত্তামাত্র দেখিতে পান। ইনি ব্রহ্ম। ইনিই সর্ব্বজীবের,

সর্ব্বভূতের আত্মা, প্রাণস্বরূপ। ইনিই (এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও) নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে প্রকটিত। অতএব জীবমাত্র স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু ভ্রমবশতঃ সে আপনাকে ক্ষুদ্র ও জন্ম মৃত্যুর অধীন ভাবে। যত দিন তাহার এই ভ্রম থাকে, ততদিনই তাহার জীবত্ব। কিন্তু যেমন তাহার অজ্ঞানটি দূর হয় অমনি সে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারে। যে এতকাল আপনাকে সান্ত ও সসীম ভাবিতেছিল, সে অনন্ত ও অসীম হইয়া যায়, বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। অতএব, জ্ঞান-মার্গীর লক্ষ্য ব্রহ্ম হওয়া, অনন্ত চৈতন্য লাভ করা। সুতরাং ব্রহ্মই তাঁহার ধ্যেয়, আরাধ্য, উপাস্য। কিন্তু ভক্তি-মার্গীর উপাস্য অন্যরূপ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম কৃপাময় শ্রীভগবানেরই আরাধনা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভগবান্ হওয়া নহে, ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া নহে, মন প্রাণ দিয়া চিরকাল সেই পরম করুণাময়ের সেবা করা, ধ্যান করা, ভজনা করা। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ, ইহাতেই তাঁহার জীবনের চরিতার্থতা। অবশ্য যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান বা ঈশ্বর। যখন তাঁহার নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অপ্রকট, পরম ভাবটির উপর আমাদের লক্ষ্য থাকে, তখন তাঁহাকে বলি ব্রহ্ম। আর যে ভাবে তিনি আপনাকে সীমাবিশিষ্ট করিয়া এই বিশ্ব ধারণ ও পালন করিতেছেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় কোটিকল্প অসংখ্য জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহার সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-

শক্তিমান্ পরম প্রেমময় ভাবটির প্রতি যখন আমাদের লক্ষ্য থাকে, তখনই আমরা তাঁহাকে বলি ভগবান্।২ জ্ঞান-মার্গী প্রথম ভাবটির উপাসনা করেন; এবং দ্বিতীয় ভাবটিই ভক্তি-মার্গীর উপাস্য। ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। কারণ, একটা নির্গুণ ও শূন্য পদার্থের উপর, একটা সীমাহীন সত্তার প্রতি, কখন ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিতে পারে না। 'ধরা ছোঁয়া' যায়, ধারণা করিতে পারা যায়, এরূপ একটি সগুণ সীমাবিশিষ্ট বস্তু না পাইলে ভক্তি প্রেম উদিত হয় না।

কিন্তু যে ভাবে তিনি বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন, ওত-প্রোত ভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া সকল জীবকে রক্ষা ও সংহার করিতেছেন,—এই যে বিশ্বমূর্ত্তি, ইহারও ধারণা করা দুর্ব্বল মানবের পক্ষে অতীব দুরূহ, অতীব কঠিন। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ভয় ও মোহই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এক মুহূর্ত্তও তিনি এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন "ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইতেছে। হে বিভো! তোমার সুন্দর প্রিয় মূর্ত্তিতে দেখা দাও।" এবং যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ মানুষ মূর্ত্তিটি ধারণ করিলেন, অর্জ্জুন বলিলেন "আঃ বাঁচ্‌লাম। এখন সুস্থ হইলাম।" অর্জ্জুনের পক্ষে যাহা, সকল জীবের পক্ষেই তাই,—বিরাট মূর্ত্তির ধ্যান করা, তৎপ্রতি প্রেম ভক্তি রাখা, বড়ই কঠিন। এই জন্য পরম করুণাময় ভগবান্ ক্ষুদ্র মানবের হিতার্থে আপনাকে আরও সীমাবদ্ধ করেন। মধ্যে মধ্যে মানুষরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। "হে বিশ্বব্যাপিন্!

হে অনন্তদেব! আমরা অতি দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র। তোমার বিরাট মূর্ত্তির ধারণা করিতে অক্ষম। হায়, তবে কি আমরা তোমার দেখা পাব না? আমরা ক্ষুদ্র ব'লে, তুচ্ছ ব'লে, হে প্রেমময়, তুমি কি আমাদের উপেক্ষা করবে?" এইরূপে যখন কোটি কোটি নরনারীর সমবেত আর্ত্তস্বর গগনমার্গে উত্থিত হয়, যখন তাহাদের হৃদয়তন্ত্রী ভগবানের জন্য, সমস্বরে কাঁপিয়া উঠে, তখন প্রেমময় আর থাকিতে পারেন না, তাঁহার করুণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, তিনি সসীম হইয়া, ক্ষুদ্র হইয়া, মানবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, মানবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তখন মানবকুল কৃতার্থ হয়, ধরিত্রী ধন্যা হয়। তখন অবিরাম প্রেমস্রোতে জগৎ প্লাবিত হয়। পশু পক্ষী অবধি সেই প্রেমে ডুবিয়া যায়। তখন মানব প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে দেখে, তাঁহার কথা শুনে, তাঁহাকে স্পর্শ করে। তখন ভগবান্ আর অস্পষ্ট, অনির্দ্দেশ্য বস্তু থাকেন না, তিনি প্রত্যক্ষ, দৃশ্য, স্পৃশ্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়গোচর হইয়া অতি ক্ষুদ্র জীবেরও দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। সকল ধর্ম্মেই নর-রূপী ভগবানের উল্লেখ আছে। সকল দেশেই কৃপাময় মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বল মানবের ধ্যান ধারণার পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছেন,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, জরথস্ত্র। এই সকল মানব-রূপী ভগবানই ভক্তিমার্গীর প্রধান অবলম্বন, আরাধ্য, উপাস্য। ভক্তের হৃদয় ইহাঁদের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, বিরাটমূর্ত্তির প্রতি সেরূপ হয় না, হইতে পারে না।

এখন ভক্তির স্বরূপ কি, কাহাকে ভক্তি বলে, দেখা যা'ক। ভক্ত চূড়ামণি নারদ, যাঁহাকে মূর্ত্তিমতী ভক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যত্তুল্য ভক্ত ত্রিজগতে নাই, তিনিই তাঁহার ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন,—

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা। ২।

অর্থাৎ ভগবানে পরমপ্রেমই ভক্তি। অতঃপর তিনি অন্যান্য মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া নিজের মতটি সর্ব্বশেষে দিয়াছেন যথা,—

পূজাদিষনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ। ১৬।

পরাশর মুনির পুত্র বলেন, পূজাদিতে অনুরাগই ভক্তি।

কথাদিষিতি গর্গঃ। ১৭।

গর্গ মুনির মতে ভগবানের কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি।

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ। ১৮।

"যেরূপ পূজাদিতে আত্মরতির বিরোধ না হয়, তাদৃশ পূজাদিতে অনুরাগই ভক্তি,"—ইহা শাণ্ডিল্য মুনির মত। কিন্তু নারদের মতে,—

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতেতি। ১৯।

ভগবানে সমস্ত অর্পণ এবং তাহার বিস্মরণে অতিশয় ব্যাকুলতা, ইহাই ভক্তি। যিনি মন, প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহার চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি নিয়ত ভগবৎ সেবাতেই নিয়োজিত, যিনি অনুক্ষণ সেই

পরমপ্রেমিককে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে জগৎ শূন্য দেখেন, যাতনায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নারদের মতে তিনিই প্রকৃত ভক্ত। ভক্তিলাভে কিরূপ ফল হয়, ভক্তের অবস্থা কীদৃশ হয়, নারদ তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন,—

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি
অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। ৪।
যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি
ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। ৫।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি
স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি। ৬।

অর্থাৎ এই প্রেম লাভ করিয়া জীব সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন। ইহা পাইলে আর কিছুরই বাঞ্ছা থাকে না, শোক দূর হয়, বিদ্বেষ চলিয়া যায়, বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না, বিষয়লাভের চেষ্টাও থাকে না। ইহার উপলব্ধিতে জীব মত্ত হন, নিশ্চেষ্ট হন, আত্মারাম হন।

অতঃপর নারদ দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, "অস্ত্যেবমেবম্"*—ইহার দৃষ্টান্ত আছে; "যথা ব্রজগোপিকানাং",† —যেমন ব্রজগোপীদিগের অবস্থা। গোপীদিগের অবস্থা কিরূপ? আহারে, বিহারে, গমনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে প্রত্যেক গৃহকার্য্যের মধ্যে, তাঁহারা অনুক্ষণ,

* নারদ-ভক্তিসূত্র।—২০ সূ।

† নারদ-ভক্তিসূত্র।—২১ সূ।

দিবারাত্রি, ভগবচ্চিন্তাতেই বিভোর, সেই সুন্দর নটবর তিলার্দ্ধও তাঁহাদের চিত্ত হইতে অপসৃত হন না, সেই মধুর মুরলীধ্বনি সদাই তাঁহারা শুনিতেছেন, সেই নবীন রসরাজকে তাঁহারা সদাই হৃদয়ে দেখিতেছেন। পরম সুন্দরের রূপে গুণে তাঁহারা একেবারেই মুগ্ধ হইয়া আছেন, ডুবিয়া আছেন। অন্য চিন্তা, অন্য ভাব, মনে আসিতে পারে না, স্থান পায় না। যত্ন করিয়া, চেষ্টা করিয়া, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া তাঁহাদিগকে মন স্থির করিতে হয় না, বিষয় চিন্তা দূর করিতে হয় না; সর্ব্বগ্রাসিনী কৃষ্ণচিন্তা অন্য সকল চিন্তাকেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা যোগাভ্যাস না করিয়াও মহাযোগিনী। চণ্ডীদাসের রাধা চিত্রটি দেখুন,—

"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা ?
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥"

যতদিন ভগবানের সাক্ষাৎ না হয়, ভক্ত এই ভাবেই জীবন যাপন করেন। তার পর, যখন প্রিয়তম দেখা দেন, ভক্তের আকাঙ্ক্ষা জানিতে চাহেন, ভক্ত বলেন,—

"বন্ধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হইও তুমি॥"

তিনি আর কি চাহিবেন? চাহিবার কিছুই নাই। তিনি তৃপ্ত হইয়াছেন, স্তব্ধ হইয়াছেন, আত্মারাম হইয়াছেন। তাই বলিতেছেন, "আর কিছুই চাহি না, অনন্তকাল তুমিই আমার হৃদয়ে থেকো, যেন তোমায় না ভুলি।" প্রহ্লাদও ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন,—

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

হে প্রাণেশ্বর! যে যোনিতেই আমি জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার প্রতি যেন সর্ব্বদাই অচলা ভক্তি থাকে।

ইহাই ভক্তের আকাঙ্ক্ষা। ভগবানের জন্য এইরূপ প্রাণের টান চাই, এইরূপ ভালবাসা চাই, এইরূপ ব্যাকুলতা চাই, তবে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয়। সে টান আমাদিগের কই? সে ভালবাসা কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "আমরা ছেলেপুলের জন্যে আধঘটি কাঁদি, টাকাকড়ির জন্যে একঘটি কাঁদি, কিন্তু ভগবানের জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলি না।" স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার সময় একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন। এক যুবক এক সাধুর নিকট আসিয়া নিত্য বলিতেন, "প্রভো, আমি ভগবানকে দেখিতে চাই। আমাকে দেখাইতে হইবে। ইহাই

আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।" সাধু ইহা শুনিয়া কিছুই বলিতেন না, মৃদু মৃদু হাসিতেন। কিন্তু যুবক ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি ক্রমশঃ অধিকতর জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাধু একদিন বলিলেন, "আচ্ছা, কল্য প্রাতে যখন আমি নদীতে স্নান করিতে যাইব, তুমিও যাইও।" পরদিন প্রত্যুষে যুবক হৃষ্ট ও আশান্বিত হইয়া সাধুর সহিত নদীতে অবতরণ করিবামাত্র, সাধু তাঁহার গলা টিপিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলেন। যুবক যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। যখন সে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল, সাধু তাহাকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! এতক্ষণ তোমার প্রাণ কি চাহিতেছিল?" হাঁফাইতে হাঁফাইতে যুবক উত্তর করিল, "বাতাস।" সাধু বলিলেন "যখন তোমার প্রাণ ভগবানের জন্য এইরূপ ব্যাকুল হইবে, এইরূপ ছট্‌ফট্ করিবে, তখনই তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তৎপূর্ব্বে নহে।"

সাধারণ মানবের ঈদৃশী আকাঙ্ক্ষা হয় না কেন? ভগবানে ভালবাসা না হইবার কারণ কি? প্রেমলাভের কোন উপায় নাই কি? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। এখন দেখা যাক্ মহাপুরুষগণ ইহার কিরূপ উত্তর দেন। তাঁহারা বলেন, "প্রেম একটি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, অর্থাৎ সকল জীবের অন্তরেই ইহা চিরকাল সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। কারণ, ভগবান প্রেমস্বরূপ এবং জীব ভগবানের অংশ। সুতরাং জীবও প্রেমস্বরূপ। তবে, এই প্রেম সর্ব্বজীবের তুল্যরূপে

বিকাশ পায় নাই, ফুটিয়া বাহির হয় নাই ; কারণ, সর্ব্ব জীবের উপাধি বা দেহ তুল্য নহে। যাঁহার উপাধি যতই বিশুদ্ধ, তাঁহাতে প্রেম ততই বিকাশ পাইয়াছে। যেমন উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড স্থূল ও মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিলে নিষ্প্রভ বোধ হয়, কিন্তু আবরণ গুলি যতই সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল হয় ততই জ্যোতি বিকিরণ করে, সেইরূপ আমাদের স্থূল দেহের ও সূক্ষ্ম দেহের উপাদানগুলি যতই বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হয়, প্রেম ততই প্রকাশ পায়। অতএব, ভক্তিলাভ করিতে হইলে দেহ ও মন বিশুদ্ধ করা চাই।" রামানুজাদি আচার্য্যগণ ভক্তিলাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঠিক এই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়।

রামানুজ বলেন, ভক্তিকামী সর্ব্বাগ্রে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবেন, অর্থাৎ বিহিত খাদ্য ভোজন ও নিষিদ্ধ খাদ্য বর্জ্জন করিবেন। যে খাদ্যের দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তাহাই বিহিত। এবং যদ্দ্বারা আলস্য, জড়তা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায় তাহাই নিষিদ্ধ। প্রেমলাভ যাঁহার লক্ষ্য, তিনি যদি রসনার তৃপ্তির জন্য নিষ্ঠুর আচরণ ও জীবহত্যা করেন, তাহা হইলে, প্রেমলাভ কিরূপে সম্ভব ? অতএব কোন জীবহিংসা বা প্রাণীকে ক্লেশ দিয়া তিনি উদরপূর্ত্তি করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ মদ্য, মৎস্য, মাংসাদি রজোগুণবর্দ্ধক। ইহা দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে যে সকল পরমাণু সঞ্চিত হয় তাহারা ভক্তিপ্রেমাদির স্পন্দন গ্রহণ করিতে অক্ষম। এইজন্য নিরামিষ ভোজন তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত

ও উপযোগী। ইহা ছাড়া আর একটি কথা তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তিনি কদাপি দূষিত খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। খাদ্য নানাপ্রকারে দূষিত হয়। যে খাদ্যে কোন বিষাক্ত পদার্থ (রোগের বীজাণু প্রভৃতি) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্থূল শরীরের অনিষ্টকর, ইহা আমরা সকলেই জানি ; কারণ, ইহা আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু খাদ্য আর এক প্রকারে দূষিত হইতে পারে। তাহা আমরা সকলে জানি না এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যও করি না। যে খাদ্য কোন দুষ্ট, নীচপ্রকৃতি, স্বার্থপর বা অপবিত্র ব্যক্তি দ্বারা ভুক্ত, স্পৃষ্ট বা দৃষ্ট হয়, সেই খাদ্যের সূক্ষ্মাংশে ঐ ব্যক্তির অপবিত্র স্পন্দন সঞ্চিত হয়। সুতরাং যিনি ঐ খাদ্য ভোজন করেন, তাঁহার মনে তওৎ অপবিত্র ভাব বা চিন্তা জাগিয়া উঠে। ঋষিগণ এই জন্যই উচ্ছিষ্ট, অন্যস্পৃষ্ট, বা যত তত্র ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। ইহা আমরা আজকাল মানি না বা বুঝি না। কিন্তু ভক্তিমার্গীকে ইহা মানিয়া চলিতে হয়, কারণ ইহা তাঁহার অভীষ্ট সাধনে কতকটা সহায়তা করে।

কিন্তু মনকে পবিত্র করিতে হইলে মনের উপরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই জন্য ভক্তিমার্গী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নীচ ভাবগুলি যাহাতে মনোমধ্যে জাগরিত না হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। ইহারা মনের জঞ্জাল বা আবর্জ্জনা স্বরূপ। ইহারাই প্রেম-হীরককে ঢাকিয়া রাখে। দুষ্ট লোকের

সহিত একত্র বাস করিলে কুভাবগুলি উত্তেজিত হয়। যাহারা ক্রোধপরায়ণ, হিংস্র প্রকৃতি, লোভী ও দাম্ভিক, তাহারা সদা কুকথা লইয়াই থাকে, কুবিষয়েরই আলোচনা করে এবং সূক্ষ্মদেহ হইতে নিরত অপবিত্র স্পন্দন বিকীর্ণ করে। এই জন্য নারদ বলিয়াছেন,—

"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ। ৪৪।

অর্থাৎ ভক্তি-মার্গীর কুসঙ্গ ত্যাগ করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। পুনশ্চ,

স্ত্রীধননাস্তিকচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্। ৬৪।

কামিনী, ধনী, বা নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। সুন্দরী যুবতীর রূপ-গুণের বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে পাছে চিত্তে কামের উদ্রেক হয়, ধনবান্ ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সম্পদের বৃত্তান্ত শুনিলে পাছে পার্থিব বস্তুর প্রতি লোভ জাগিয়া উঠে এবং নাস্তিকের কুতর্ক ও শ্রদ্ধাহীন বিতণ্ডাদি শ্রবণে পাছে অবিশ্বাস ও সংশয় উদিত হয়, এই কারণে ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা ভক্তি-মার্গীর নিষিদ্ধ।

আহার ও সহবাসের পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিতে করিতে ভক্তি-মার্গীর চিত্তে ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইতে থাকে। এখন তাঁহার সাধু-সহবাসের ও ভগবৎ-কথা-শ্রবণের প্রবৃত্তি হয়। যেখানে ভগবানের কথা, গুণকীর্ত্তন, পূজা, বা উপাসনা হয়, যেখানে কোন সৎগ্রন্থ পঠিত হয়, তাঁহার প্রাণ সেইখানে যাইতে চায়। এইজন্য তিনি দেবালয়ে, তীর্থস্থানে, ও ভক্তসমীপে,—

মধ্যে মধ্যে,—যাতায়াত আরম্ভ করেন। সংসারের রোগ-শোক-তাপ-জ্বালায় যখন প্রাণটা বড়ই কাতর হয়, তখন তিনি ভাবেন,—"হায়! জুড়াইব কার কাছে? কে আমার কথা শুনিবে? আমার ব্যাথার ব্যাথী কে আছে? সেই সর্ব্বতাপহারী ভিন্ন কে আর শান্তি দিতে সমর্থ?" এই ভাবিয়া তিনি কোন দেবালয়ে বা ভক্তসমীপে গিয়া ক্ষণেকের তরে প্রাণের জ্বালা জুড়ান, কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করেন। এইরূপে, তিনি প্রথমে আর্ত্ত-ভক্ত হন। কিন্তু ভগবৎ কথা শুনিতে শুনিতে, যতই অধিক আনন্দ হইতে থাকে, যতই নেশা জমিতে থাকে, আকর্ষণ যতই গাঢ় হয়, ততই আর্ত্তির কথা ভুলিতে থাকেন, তিনি যে শোক তাপ জুড়াইতে আসিয়াছেন তাহা আর মনে থাকে না। যেমন এক ব্যক্তি দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য মদ্যপান আরম্ভ করিয়া শেষে মদ্য পানের জন্যই মদ্য-পান করে, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

ক্রমে নেশা যত জমিতে থাকে, তিনি নিজ গৃহেই ভজন আরম্ভ করেন। প্রথমে কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে, প্রাতঃকালে এতক্ষণ, সায়ংকালে এতক্ষণ। পরে, এই সময় ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া, তাঁহার অধিকাংশ দিবা-ভাগই ভজন-কার্য্যে অতিবাহিত হয়। ক্রমে রাত্রি-ভাগেও ভজন চলিতে থাকে এবং ইহা নানা আকার ধারণ করে। কখনও ধ্যান, কখনও পূজা, কখনও গুণ-গান, এবং কখনও বা তাঁহার মহিমা-পাঠ করেন। এইরূপে দিবারাত্রি তিনি ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। কিছুকাল এইরূপ

করিতে করিতে তাঁহার কেমন একটা অতৃপ্তি উদিত হয়, যেন একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিতে থাকে। তিনি যেন আর ভজনে আনন্দ পান না, প্রাণ যেন আর কিছু চায়। তখন একটু চিন্তা করিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার প্রাণ অপরকেও এই আনন্দ দিতে চাহিতেছে, সকলকেই ইহার অংশীদার করিতে চায়। তিনি ভাবেন, "হায়! অজ্ঞান জীব-কুল বিষয়ানন্দকেই পরমানন্দ ভাবিতেছে। তাহারা যদি একবার এই আনন্দের আস্বাদ পায়, ক্ষণমাত্র পরম সুন্দরের মধুরতা উপলব্ধি করে, তাহা হইলে তাহাদের শোকতাপ দূরে যায়, জীবন ধন্য হয়। আমি একাকী নির্জ্জনে ইহা উপভোগ করিতেছি, আর চারিদিকে কোটি কোটি মানব এক ফোঁটা প্রেমের জন্য, এক বিন্দু ভক্তির জন্য ছটফট্ করিতেছে! যক্ষের ধনের ন্যায় এই আনন্দ কি নিজের মধ্যেই পূরিয়া রাখিব? কাহাকেও এক কণা দিব না? অহো, ভক্তশিরোমণি নারদ! দিবারাত্রি প্রেমে বিভোর! কিন্তু কই, ইহাতে তো তাঁর তৃপ্তি নাই? তিনি বীণা যন্ত্র হাতে লইয়া ত্রিলোকময় ছুটাছুটী করেন কেন? তাঁহার প্রেম-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উহা জগৎকে প্লাবিত করিতে চায় বলিয়া। তিনি যে আনন্দে বিভোর, বিশ্ববাসীকে সেই আনন্দ দিতে চান। তিনি অমর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাতে কি? যদবধি ত্রিলোকের সকলেই অমৃতত্ব না পায়, যতক্ষণ একটি জীবও সে আনন্দে বঞ্চিত থাকে, ততক্ষণ নারদের তৃপ্তি নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই। হে পরম ভক্ত! পরম প্রেমিক!

তোমাকে নমস্কার। আবার, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের অবস্থাই বা কি? যখন ভগবান নিজ মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন ও বর দিতে চাহিলেন, প্রহ্লাদ অচলা ভক্তি চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে কি তাঁহার তৃপ্তি হইল? তিনি বলিলেন, 'হে কৃপানিধে! এই কোটি কোটি জীবের তুমি ভিন্ন আর গতি নাই। ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। ইহাদিগকে প্রেম দাও, ভক্তি দাও। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা। হায়! আমি কি কেবল এরূপ আনন্দ একাই ভোগ করিব!"

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে ও ভক্ত-জীবন-আলোচনা করিতে করিতে, জীবের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তিনি সকলকেই তাঁহার আনন্দের ভাগ দিবার জন্য ব্যাকুল হন। তখন তিনি আর স্বার্থপর হইয়া নিজের আনন্দের জন্য ভজনা করেন না, জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাহাদের হাতে ধরেন, পা'য়ে ধরেন, কাকুতি মিনতি করেন, অশ্রু-পাত করেন। বলেন "ভাইরে, তোরা একবার চোক্ মেলিয়া দেখ্, তাঁর কি রূপ, কি গুণ! অমন প্রেম আর আর কারো নাই। একবার তাঁর দিকে ফিরে চা', সব জ্বালা দূর হবে। সে রূপ দেখে ম'জে যাবি, শোক তাপ ভুলে যাবি।" এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আরও কোমল হইতে থাকে, জীবে দয়া ও ভগবানে প্রেম আরও ঘনীভূত, গাঢ় হইতে থাকে। তখন যদি কেহ তাঁহাকে একটি স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তিনি

আপ্যায়িত হন, অনুগৃহীত বোধ করেন, ভাবেন তাহার বড় দয়া। তখন তাঁহার মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাকে ভাল বাসিতেছে, অজস্র প্রেম বিতরণ করিতেছে। পুষ্প সৌরভ দিতেছে, নদী জল, বৃক্ষ ফল-ছায়া, সূর্য্য তাপালোক, চন্দ্র সুষমা, মেঘ বৃষ্টি, ও গৃহ আশ্রয় দান করিতেছে। তখন অচেতন পদার্থও তাঁহার নিকট সচেতন হয়, কথা কয়। তিনি দেখেন সকলেই অযাচিত ভাবে তাঁহাকে দান করিতেছে। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হয়। তিনি বলেন,—"হাঁরে, আমি তো তোদের কিছুই দিই নাই ; তোরা আমায় দিস্ কেন ?"

এইরূপে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অযাচিত দান, প্রেমের খেলা, দেখিতে পান। গাভী যখন হাম্বারবে বৎসের গাত্রলেহন করে, পক্ষিনী যখন চঞ্চুপুটে আহার আনিয়া শাবকের মুখে নিক্ষেপ করে, বিড়ালী যখন শাবকের আর্ত্তস্বর শুনিয়া ব্যস্তত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসে, জননী যখন পীড়িত সন্তানকে বুকে রাখিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়, তখন তিনি প্রেমের খেলা দেখিয়া বিমুগ্ধ হন, স্তম্ভিত হন। আর ভাবেন "এত প্রেম কোথা হইতে আসিল ? ধরাতল যে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে ! বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গিরি-নদী, জল-বায়ু, রবি-শশী, নর-নারী, সকলেই যেন প্রেমে উন্মত্ত, মাতো-য়ারা ! এ বন্যা আসিল কোথা হইতে ?" যখন তিনি একান্ত মনে উহাই চিন্তা করেন, তখন তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হয়,—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

ইহা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠেন,—বলেন, "ওহো, বুঝিয়াছি। সেই আলোকেই সব আলোকিত, সেই প্রেমেই সবাই প্রেমিক! যেমন পর্ব্বত শিখর হইতে এক প্রকাণ্ড জলরাশি হুড় হুড় করিয়া নামিয়া আসে, দেশ প্লাবিত হইয়া যায়, নদ নদী, খানা ডোবা, খাল বিল, পূর্ণ হয়, যাহার যতটুকু আয়তন সে ততটুকুই ধারণ করে, সেইরূপ এক অনন্ত প্রেমই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিভিন্ন আধারে, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি সুন্দর বলিয়াই সবাই সুন্দর, তাঁর গৌরবেই সকলের গৌরব। তাঁর সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র পাইয়া জগতের সৌন্দর্য্য। বিকশিত পুষ্প, বিচিত্র বনভূমি, বিশাল জলধি, অভ্রভেদী গিরিরাজি, স্রোতস্বতী তটিনী, তারকা খচিত আকাশ,—জগতে যত সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তই তাঁরই একটি কোমল কটাক্ষমাত্র, একটি মৃদু হাস্য-রেখা। তিনি ভালবাসিতেছেন, তাই সকলেই ভালবাসে। তাঁর প্রেমই অসংখ্য মূর্ত্তিতে, অসংখ্য আধারে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাতায় সেই প্রেম, পিতায় সেই প্রেম, বন্ধুতে সেই প্রেম, পুত্রে সেই প্রেম। তিনিই নানা মূর্ত্তি ধরিয়া ভালবাসিতেছেন, প্রেম বিলাইতেছেন। তিনিই মাতৃরূপে স্নেহ দিতেছেন, সূর্য্যরূপে তাপালোক দিতেছেন, বৃক্ষরূপে ফল-ছায়া দিতেছেন, নদীরূপে জল দিতেছেন। যে কেহ আমা-

দিগকে সাক্ষাৎভাবে ভালবাসে, তাহা তিনি ; আবার যে কেহ পরোক্ষভাবে ভালবাসে তাহাও তিনি। তিনিই শক্ররূপে আমাদিগকে পরোক্ষভাবে ভাল বাসিতেছেন, আমাদের বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, সহিষ্ণুতাদি গুণের বিকাশ সাধন করিতেছেন। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা ও সমৃদ্ধিশালী নগরে যে কৃপা প্রস্ফুট, ভীষণ জল-প্লাবন ও জল-শূন্য মহাদেশে সেই কৃপাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়-রাত্রি, মলয়-মারুত, যমুনা-সৈকত ও মোহন মুরলীতে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে, অমানিশা, ভীষণ শ্মশান, ঝটিকা, বৃষ্টি ও রুধির-রসনা করাল-বদনার বিকট হুঙ্কারে সেই প্রেমই তো দেখিতেছি! সবই সেই এক প্রেমিকের রূপান্তর, বিভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র। তিনিই রোগ তিনিই স্বাস্থ্য, তিনিই সম্পদ্ তিনিই বিপদ, তিনিই শত্রু তিনিই মিত্র, তিনিই তিক্ত তিনিই মিষ্ট। আলোকেও তিনি, আঁধারেও তিনি, জয়ও তিনি পরাজয়ও তিনি, সাহসও তিনি ভয়ও তিনি, স্বর্গও তিনি নরকও তিনি। ধন্য সেই পরম প্রেমিক, যাঁর প্রেমে সবাই প্রেমিক!"

এইরূপে, ভক্তি-মার্গী ভগবানের প্রেমময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে পান,—পত্র-পুষ্প-ফলে, গিরি-নদী-প্রস্রবণে, পশু পক্ষী-মানবে সেই প্রেমময়ের করুণ আঁখি, সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করেন। তখন গ্রহ-তারা, সিন্ধু-সরিৎ, বৃক্ষ-লতা, তাঁহাকে মধু বর্ষণ করে। প্রচণ্ড অগ্নি মধ্যেও তিনি পদ্ম-পত্রের কোমলতা ও শৈত্য অনুভব করেন। তখন তাঁহার মনে হয়, "যে করুণাবশতঃ শাক্যসিংহ

রাজ্যৈশ্বর্য্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া মানব-জাতির জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, যে প্রেম গৌরাঙ্গকে জীবের-জন্য পথে পথে কাঁদাইয়াছিল, এবং ক্রুস-বিদ্ধ মুমূর্ষু যীশুকে হত্যাকারীদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করাইয়াছিল,—সেই করুণা, সেই প্রেম শ্রীভগবানের এক কণা মাত্র এক কণারই এত প্রভাব, এত জ্যোতি যে, সমস্ত পৃথিবী তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত, আলোকিত! না জানি সমগ্র প্রেম কি বিশাল, অগাধ, অনন্ত!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া যায়, সেই অনন্ত প্রেম যেন তিনি দেখিতে পান, উপলব্ধি করেন। ভগবান নিজ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন! সেই মূর্ত্তি এত সুন্দর, এতই মনোরম যে, তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি তাঁহাতে চির-নিবদ্ধ হইয়া যায়, অন্যদিকে আর ফিরিতে পারেনা। তিনি সেই রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া যান, ডুবিয়া থাকেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার জীবনে একটি যুগান্তর উপস্থিত হয়, একটি প্রলয় হইয়া যায়। তিনি পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, আর তাহা থাকিতে পারেন না।

তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক—২-২-৮

[তাঁহার বিষয়-বন্ধন খসিয়া যায়, সকল সংশয় দূর হয়, নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় পায়।]

তখন,—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা,—৬-২২

জগতের যাবতীয় পদার্থ তাঁহার নিকটে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর, নিষ্প্রভ হইয়া যায়, কারণ তিনি পরম সুন্দরকে পাইয়াছেন। তখন সহস্র বিপদ আপদ তাঁহাকে তিলার্দ্ধ টলাইতে পারে না, কারণ তিনি স্থির বস্তুতে লগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

তখন,—

রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

পরম-পুরুষকে পাইয়া বিষয়-বাসনা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়।

তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় কখনও হাস্য করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হন। সাধারণ লোকেরা তাঁহার ভাব না বুঝিয়া নিন্দা করেন, গালি দেন, কলঙ্ক রটান। কিন্তু, তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, সমস্ত তৃণবৎ উপেক্ষা করেন। বলেন,

"বলে বলুক, মোরে মন্দ, আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥"

"জাতি, জীবন, ধন, কালা!
তোমরা আমারে, যে বল, সে বল;
কালিয়া গলার মালা॥

সই, ছাড়িতে যদি বল তারে!
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে?

চণ্ডীদাস।

অতএব, তিনি প্রিয়তমকে আর ছাড়িতে পারেন না, তাঁহাতে মজিয়া থাকেন, ডুবিয়া থাকেন। কখনো বলেন,—

"বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোমারে সঁপেছি,
জাতি, কুল, শীল, মান॥" চণ্ডীদাস।

আবার কখনো বলেন,—

"তুমি সে পরশ মণি হে
তুমি সে পরশ মণি।
তোমার পরশে এ তনু আমার
সোণার বরণ খানি॥"

চণ্ডীদাস।

বাস্তবিক তাহাই ঘটে। তাঁহার দেহখানি ক্রমশঃ সোণার বরণই হইতে থাকে। যে যাহা ভাবে সে তাহাই হয়, ইহা একটি অকাট্য ধ্রুব সত্য। আরসুলা যেমন কাচপোকার রূপ ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকা হইয়া যায়, যোগীও সেইরূপ আত্মার (ভগবানের) রূপ সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে আত্মাই হইয়া যান। দিবারাত্র, আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে অনুক্ষণ সেই পরম সুন্দরকে দেখিতে দেখিতে, তিনিও

সুন্দর হইয়া যান, অনন্ত প্রেম-সাগরে মিশিয়া যান। অথবা সেই প্রেম-সাগর তাঁহারই মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, আবির্ভূত হয়। তখন আর দুইটি থাকে না, এক হইয়া যায়,—রাধা-অঙ্গ শ্যাম-অঙ্গে মিশাইয়া যায়, নদী সমুদ্রে লীন হয়। তখন তিনি দেখেন তিনিই অনন্ত প্রেম-সমুদ্র, তিনিই অসংখ্য জীবরূপে আনন্দ করিতেছেন। তিনি দেখেন, সবই তাঁহাতে অবস্থিত, সবই তাঁহার। তিনিই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সকলকে বুকে ধরিয়া লালন পালন করিতেছেন। তিনি এখন এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—২-৩।

অস্ত্র তাঁহাকে ছেদন করে না, অগ্নি দগ্ধ করে না, অগ্নিশিখা পদ্ম-পত্রের ন্যায় বোধ হয়, অতলস্পর্শ সমুদ্র তাঁহার অঙ্গ আর্দ্র করে না, মত্ত মাতঙ্গের পদভরে তিনি পেষিত হন না। তিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনি অমৃত হইয়াছেন।

এইজন্য নারদ বলিয়াছেন,—

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা। ২।

[আমি যে ভক্তির ব্যাখ্যা করিব, তাহা শ্রীভগবানে পরম প্রেম-রূপা।]

অমৃতস্বরূপা চ। ৩।

[প্রেম অমৃতস্বরূপ। ইহা জীবকে অমর করিয়া দেয়।]

ভারতের এই বিষম দুর্দ্দিনে, এই আত্মম্ভরিতা, দম্ভ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, জাতীয় বিদ্বেষ ও ক্রূরতার দিনে, যদি কোন ভক্ত, যদি কোন প্রেমিক, কৃপাপূর্ব্বক এই ঋষিগণ-সেবিত, প্রণব-নিনাদিত দেশে আবির্ভূত হন, অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে ভারতের সব দুঃখ ঘুচিয়া যায় ; প্রেমে দেশ প্লাবিত হয়; ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, নীচতা সঙ্কীর্ণতা, দর্প, কুসংস্কার কোন রসাতলে ডুবিয়া যায় ; সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তৃণাদপি নম্রতা, দয়া ও স্বার্থত্যাগ একাধিপত্য করে। প্রেমিকের এতই মহিমা, এতই প্রভাব! মহাভারতের যুগে যখন পরম প্রেমিক স্বয়ং আসিয়াছিলেন, তখন একবার প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী শত শত বৎসর পর্য্যন্ত সেই স্রোত অব্যাহত ছিল। তাই মহাভারতে প্রেমের উদারধ্বনি শুনা যায়,

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

জাতি পূজনীয় নহে, গুণ দেখিয়াই বিচার। চণ্ডাল সদ্‌গুণ বিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণবৎ পূজনীয়।

আবার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আর একবার প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছিল। বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া সেই স্রোত দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন আবার সেই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, সেই আচণ্ডালে প্রেম

বিতরণ, যবনকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন, সর্ব্বজীবে দয়া, ভগবানে ভক্তি, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, অতুলনীয় বিনয় দেখা গিয়াছিল। আজও সেই স্রোত বৈষ্ণব ভক্তদিগের মধ্যে মৃদুমন্দ ভাবে বহিতেছে। কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। হায়! এ দুর্দ্দিন কি ঘুচিবে না? এ দুরাবস্থার কি অবসান নাই? কোন মহাপ্রেমিক কৃপা করিয়া এই পতিত জীবগণকে উদ্ধার কি করিবেন না? আবার কি ভারতময়, পৃথিবীময়, বিশ্বপ্রেমের বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিবে না? যেখানে আশা, যেখানে প্রতীক্ষা, সেইখানে পূর্ণতা, সেইখানেই সাফল্য। আজ যদি কোটি কোটি জীব উৎসুক হইয়া উৰ্দ্ধনেত্রে সেই মহাপ্রেমিকের আহ্বান-গীতি গান করেন, যদি একান্তমনে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই করুণা-ময়ের আসন টলিবে, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তিনি নররূপে অবতীর্ণ হইয়া আচণ্ডালে প্রেমদান করিবেন। সর্ব্বত্র যেরূপ সুবাতাস বহিয়াছে, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সর্ব্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ আশান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সেই সুদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

[উঠ, জাগ, বরপুরুষগণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভ কর!]

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

সাধক শাস্ত্র-বচন।

(১) ভক্তিমার্গ যে অপেক্ষাকৃত সুগম তাহা শাস্ত্রের অনেক স্থলেই দেখা যায় ; যথা দেবীভাগবতে আছে,—

"স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব ! যেন জ্ঞানং সুখেন হি।
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিণঃ ॥" ৭।৩৭।১

হিমালয় দেবীকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"মাত! অবিরাগী মধ্যম মনুষ্যগণের যাহাতে সুখে ব্রহ্ম-লাভ হয়, এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ কীর্ত্তন করুন।

এতদুত্তরে দেবী বলিতেছেন,—

"মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ !
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ! ॥৭।৩৭।২

"ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥" ৭।৩৭।৩

নগেন্দ্র ! মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি পন্থাই বিখ্যাত। উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কারণ এই যোগে না অর্থ ব্যয়, না শারীরিক ক্লেশ, না চিত্তের একাগ্রতা সাধন, কিছুই নাই ; কেবল মনোবৃত্তি চালনা করিলেই সকলে অনায়াসে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হয়।

(২) সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একেরই দুইটি ভাবমাত্র।

"সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ"

[বিষ্ণু সগুণ এবং তিনিই নির্গুণ।]

"লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ"
ভাগবত ৩।৭।২ •

[নির্গুণ ব্রহ্ম লীলা বশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন।]

"সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্।" ঐ ৭।৯।৪৮

[হে সর্ব্বব্যাপিন্! তুমি সগুণ ও নির্গুণ, তুমি সমস্তই।]

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

"সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মি সৃষ্টি-স্থিতি-কাল-সংলয়ঃ।" ১।১।২

[যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ হইতে জাত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম।]

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ॥
ভাগবত ১।২।১১

[সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানী "তত্ত্ব" আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান বা সগুণ ব্রহ্ম।]

(৩) শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে আহার্য্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,— •

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

[যে দ্রব্য আহারের দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে ; যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহপ্রধান ; যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় ; আর যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট বা উগ্র গন্ধযুক্ত নয়) ; ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অম্ল, লবণযুক্ত এবং উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষতাকারক, এবং উত্তাপবর্দ্ধক, উহা রাজসিক প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে ; ঐ সকল আহারের দ্বারা দুঃখ, শোক ও নানাপ্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধ পক্ক এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে), এবং দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত ও উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার সকল তামস লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।]

(৪) দুষ্ট লোকের সহিত বাস করিলে কুভাবগুলি উত্তেজিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সহ শয্যাসনাৎ যানাৎ সংলাপাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

[একবিন্দু তৈল জলে পড়িলে যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, তেমনই যাহারা এক শয্যায় শয়ন, একাসনে গমনাগমন করে, অথবা একত্র বসিয়া কথোপকথন বা একত্র বসিয়া ভোজন করে, তাহাদিগের পরস্পরের পাপ পরস্পরের দেহে সংক্রামিত হয়।]

(৫) এই ভাবকেই লক্ষ্য করিয়া দেবর্ষি নারদ ভক্তিসূত্রে বলিতেছেন,—

তন্ময়াঃ ॥—৭১

[তাঁহারা নিজেও তন্ময় হয়েন এবং জগৎকেও তন্ময় দেখেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবান এবং সর্ব্বভূতকে ভগবানে দর্শন করিয়া থাকেন।]

(৬) তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সকল দিক সুখময় হইয়া যায়। নারদ বলিতেছেন,—

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥—৭২

[তাঁহাদিগের প্রেমে পিতৃলোক, ও ভূর্লোক সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। তাদৃশ পুত্র পৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া পিতৃলোক অমৃত হইবেন বলিয়া আমোদিত হয়েন। তাদৃশ ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করিয়া দেবতারা নিজ নিজ অধিকারের মঙ্গল ভাবিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তাদৃশ ভক্তের সমাগমে নিখিল ভূতই শান্তি সুখ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন।]

(৭) তখন আর উপাস্য ও উপাসকে প্রভেদ থাকে না। দেবী ভাগবতে ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

ইত্থং জাতা পরা ভক্তির্যস্য ভূধর ! তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥

৭ম স্কন্ধ ৩৭—২৭

[হে ভূধর যে ব্যক্তির হৃদয় যথার্থই এই প্রকার

পরাভক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

(৮) পরাভক্তি ভক্ত ও ঈশ্বরকে এক করিয়া দেয়, তাহা ভগবান কপিল, মাতা দেবহুতিকে উপদেশ-ছলে বলিয়াছেন,—

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিক্রম্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

[যাহা দ্বারা গুণত্রয় (মায়া) অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বথা যুক্ত হয় সেইটাই আত্যন্তিক ভক্তি-যোগ।]

